সৎসঙ্গ গ্রন্থমালা—২

বিশেপাগ্‌লার চিঠি।

প্রথম তাড়া

প্রকাশক শ্রীশাক্যসিংহ সেন
"সৎসঙ্গী"-পুস্তক বিভাগ।
১২নং নন্দলাল বসুর লেন, কলিকাতা।

মূল্য আট আনা।

সৎসঙ্গ গ্রন্থমালা—২

বিশেপাগ্‌লার চিঠি।

প্রথম তাড়া

প্রকাশক শ্রীশাক্যসিংহ সেন
"সৎসঙ্গী"-পুস্তক বিভাগ।
১২নং নন্দলাল বসুর লেন, কলিকাতা।

মূল্য আট আনা।

নির্ঘণ্ট

পৃষ্ঠা

বিশেপাগলার চিঠি

(১)

দাদা, শাস্ত্র-পড়া ছেঁদো কথা আর মানুষকে শুনিয়ে কোন লাভ হবে না। সাংখ্য-বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্রের চুল-চেরা বিতর্ক আর পুরাণতন্ত্রাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের সৃষ্টি বা সাধনের তত্ত্বপ্রসঙ্গ শুনে শুনে মানুষের একটা কু-অভ্যাস হ'য়ে গেছে। তাই লোকে সত্যি কথাটা সোজা ক'রে চলতি ভাষায় শুনতে যেন রাজি নয়। অনেক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাণ্ডিত্য-পূর্ণ পারিভাষিক দিয়ে একটা হেঁয়ালী রচনা ক'রলে তবে তা বেশ শ্রুতিমধুর হয়। যদি বলা যায়—ভগবানের মরজিতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, অথবা ভগবান নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েই এই অনন্ত কোটী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জাল রচনা ক'রেছেন; তা হ'লে কথাটি নিতান্ত মূর্খের মত হোলো, আধুনিক সৌখীন পাঠকেরা তা শুনে হয়ত নাসা কুঞ্চিত ক'রবেন। কিন্তু যদি বলি,—"পুরুষ নির্গুণ ও অকর্ত্তা, সুতরাং সৃষ্টি ক'রবার শক্তি তাঁর নাই। তিনি কেবল চিৎস্বরূপ আর সাক্ষিস্বরূপ। তাঁহারই সান্নিধ্যহেতু প্রকৃতিই

এই সৃষ্টির কর্ত্রী;—অচিৎস্বরূপা গুণময়ী প্রকৃতির উপর চৈতন্য পুরুষের অধ্যাসবশতঃ প্রকৃতির ভিতর গুণক্ষোভ হওয়ায় যে বিকৃতি হ'ল তারই নাম সৃষ্টি।"—তাহ'লে কিছু বোধগম্য হোক আর নাই হোক্, লেখক কিন্তু সকল দায় থেকে খালাস, যেহেতু তাঁর ভাব ও ভাষায় সাংখ্যদর্শনের সইমোহর আছে। অথবা যদি মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে অসদ্বস্তু মিথ্যাভূতা ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যার উপরে একমাত্র সদ্বস্তু নিগুর্ণ অক্ষর সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের অধ্যাস-পূর্ব্বক, 'মায়োপাধিক-চৈতন্য' -নামধারী একজন ঈশ্বরকে খাড়া ক'রে তাঁকেই এই দুঃস্বপ্নমূলক মিথ্যা সৃষ্টির জন্য দায়ী ক'রে একদিকে অব্যয় পরমাত্মার একত্ব ও অপরদিকে সৃষ্ট নামরূপের মিথ্যাত্ব, দুই-ই প্রমাণ করা যায়, তাহ'লে লেখক ও পাঠক এই ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যা বুঝেন তা একটা বৃহৎ হয়াণ্ডের মত হ'লেও, কারো কিছু ব'লবার যো নেই, যেহেতু লেখকের ভাব ও ভাষা শঙ্করসম্মত। আসল কথা কিন্তু এই কি এত আত্মানাত্মবিচার, সদৃশপরিণাম স্বরূপ-পরিণাম, স্বগতভেদ সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ, নিমিত্তকারণ উপাদানকারণ, লক্ষণা ব্যঞ্জনা, ছয় রকমের প্রমাণ, আরও

কত রকম (আমি কি ছাই সব জানি না বুঝি) দুরূহ যুক্তিপ্রমাণের গুলিগোলায় আর কর্কশ শব্দের আঘাতে দর্শনকারেরা আমার প্রাণের ঠাকুরকে খুন ক'রবার উদ্যোগ ক'রেছে! মায়া ব'লে মিথ্যা বস্তু যদি কিছু থাকে তবে তা এ সংসারটা ত নিশ্চয়ই নয়, বরং ঐ দর্শনগুলোর ভাষ্যকারদের যুক্তিজালের বিচিত্র প্রপঞ্চটাই সত্যি সত্যি মায়া ব'লে উড়িয়ে দেবার জিনিস। আস্তিকদর্শনগুলোর রবিকিরণ বরং কতকটা সইতে পারি, কিন্তু রবিকরে উত্তপ্ত ভাষামরুর বালুকারাশির তাপ যে মোটেই আমার সয় না। অত খটখটে শুক্‌নো আর ঝাঁঝালো বালির রাশির মাঝে মিথ্যামায়ার মরীচিকা ছাড়া আর কি থাকতে পারে?— সেখানে আমার আনন্দময় রসের ঠাকুর ত নিশ্চয় নেই।

কেমন করে ভগবান এই বিশ্বসংসার সৃষ্টি ক'রেছেন বা স্বয়ং এই বিশ্বসংসাররূপে সৃষ্ট হয়েছেন তা বোঝবার জন্যে এত বুদ্ধি খরচ নাই বা করা গেল? দর্শনকারেরা যুক্তিপ্রমাণের লাঠির উপর ভর দিয়ে কি-হাত নানাভঙ্গীতে Somersault খেতে খেতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হ'য়েছেন তার চেয়ে ঢের বেশী দামী জিনিস এতটুকু ভাগবত-

প্রেরণাযুক্ত সরল প্রাণের সহজ বিশ্বাস। পণ্ডিতের পাহাড়-প্রমাণ শুষ্ক শাস্ত্র-জ্ঞানের চেয়ে মূর্খের এতটুকু সরল বিশ্বাস লক্ষগুণে বেশী ভারি। সাংখ্যকার ষাট হাজার বছর তপস্যা ক'রে যে দর্শন লাভ ক'রেছিলেন তার ভিতর হাজার সত্যি কথা থাক,—যদি দর্শন না থাকে, অনুভূতি না থাকে—তবে তাতে তোমার আমার কি আসে যায়? বৌদ্ধ মায়াবাদ বা শূন্যবাদকে খণ্ডন ক'রবার জন্যে শঙ্করাচার্য্যকে বাধ্য হ'য়ে ঐ বৌদ্ধ মায়াবাদীরই ভাব ও যুক্তির ভাষাকে অবলম্বন ক'রে যে সব জটিল যুক্তিজালের অবতারণা ক'রতে হ'য়েছিল, তা শুনে আজকার যুগে তোমার আমার বিশেষ লাভ হবে না। আমার প্রাণের ভিতরের বিরাট পুরুষকে ছেড়ে, আমার বুকের ঠাকুরের পাগল-করা বাঁশীর ডাক না শুনে কি জন্যে কেতাবী যুক্তিতর্কের ঘর্ঘর শব্দে সাধ করে কাণ ঝালাপালা ক'রতে যাব? সাংখ্যের বহু পুরুষবাদ আর শঙ্করের মায়াবিজড়িত একপুরুষবাদ যখন প্রচারিত হ'য়েছিল, তারপর যে এতটা কাল কেটে গেল তা বৃথা কাটেনি। ঐ দর্শনগুলোর যুগের পর থেকে জগন্নাথের সৃষ্টিচক্রের রথের চাকাগুলো ক্লান্ত হ'য়ে থমকে দাঁড়িয়ে

হ'য়েছে, অথবা শঙ্করের তিরোভাবের পর পিছন দিকে হটে গিয়েছে, এমনতর একটা ধারণা ক'রবার কোন কারণ দেখতে পাচ্ছিনে। সে চাকার গতি চিরদিনই অবাধ আর চিরদিনই সামনের দিকে। একদল সুপণ্ডিত লোকে কিন্তু প্রাচীনের প্রতি বেজায় অনুরক্ত হ'য়ে নবীনকে অবজ্ঞা ক'রে আসছেন। তাঁদের হাতে একটা ক'রে দূরবীণ আছে। যখন ভারত-গৌরবের দিকে তাঁরা দৃষ্টি সঞ্চালন করেন, তখন সেই দূরবীণের সোজা দিকটা দিয়ে দেখেন, আর সব বড় বড় দেখ্তে পান; আর হাতের গোড়ায় নবীনের দিকে যখন তাকান, তখন তাঁরা ঐ দূরবীণটা ঘুরিয়ে উল্টো ক'রে নেন—তাই নিকটের জিনিষগুলো হাজার বড় হ'লেও ছোট দেখায়। তাঁদের বিচারে বশিষ্ঠ-যাজ্ঞবল্ক্যাদি প্রাচীন ঋষিগণের তুলনায় আমাদের দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণঠাকুর একজন উচ্চদরের সাধক মাত্র। গৌরাঙ্গঠাকুর তাঁদের দূরবীণ-আঁটা চোখে "ন চ পূর্ণঃ ন চাংশকঃ"। গৌরাঙ্গঠাকুর কিঞ্চিৎ পুরাতন হ'য়ে আসছেন তাই তাঁর খাতিরটা ক্রমেই কিছু কিছু বাড়ছে, কিন্তু রাম-কৃষ্ণ ঠাকুর এই সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ব'সে ব'সে অঙ্গুরী

তাদাকের শ্রাদ্ধ ক’রে গেল,—না মেরেছিল রাবণ না ধ’রেছিল গোবর্দ্ধন,—সে আবার অবতার কিসে? পুরাতনের রসে আমরা একেবারে মশ্‌গুল হ’য়ে আছি। এ ঘোরটা কাটিতে সময় লাগ্‌বে বৈ কি। শ্যামের বাঁশী এবারে যে নূতন সুরে বেজে উঠেছে। তা শুনতে শুনতেই মানুষের রসবোধ হ’তে থাকবে। তোমার আমার ব্যস্ত হতে হবে না। কেন না যুগ পাল্‌টে গিয়েছে।

আবার সত্যযুগ আস্‌ছে এ কথা ব’ল্লে, সেই প্রাচীন-কালের সত্যযুগটি অথবা সেই রকম একটা কিছু কালচক্রে ঘুরতে ঘুরতে আবার ফিরে আস্‌ছে, এমনতর একটা আশঙ্কা ক’রবার কোনই কারণ নেই। সেই সেকালের সত্যযুগটি যতই কেন আমাদের গৌরবের সামগ্রী হোক না, সেই যুগে মানুষের জীবন যতই কেন সুন্দর হোক না, আমরা সে যুগের যতটুকু জানি, তাতে সেই সত্যযুগকে মানুষের চিরন্তন আদর্শের যুগ ব’লে মেনে নিতে পারি না। সেই আদর্শ অনুসারে খুব বড় বড় যজ্ঞ ক’রে গ্রামে গ্রামে নিত্য দু’চার মণ ঘি জ্বালিয়ে আমরা পুরাতনের প্রতি সমাদর দেখাতে পারবো না; অথবা দেদার গরু-ঘোড়া

কেটে তাদের রক্তে দেবতাদের তৃপ্তিসাধন ক'রতেও প্রস্তুত নই। নদনদীর তীরে গৌরকান্তি মুণ্ডিতমস্তক দীর্ঘনাসা আর্য্যগণ সামগানে ভারতের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুল্‌তেন—এই কথা শুনেই আমরা আবার নদীর তীরে তীরে বেদমন্ত্র আওড়ে জীবনটাকে কাটিয়ে দিতে মোটেই রাজি নই; অথবা তাঁদের সমাজে নিয়োগপ্রথা বা ঐ ধরণের যে সব প্রথা ছিল, আজ এই এমন দিনেও সেই সকল প্রথাগুলোকে ঘৃণার চক্ষে না দেখে, সত্যযুগের প্রথা ব'লে খাতির ক'রে আমাদের সমাজের মধ্যে চালিয়ে দিতেও পারবো না। মোট কথা অনুকরণ কারুরই ক'রব না—তা সাহেবদেরও না, আর আমাদের অতি-গৌরবের আর্য্য পূর্ব্বপুরুষদেরও না। অনুকরণ মানেই আত্মহত্যা। সাহেবদের অনুকরণ ক'রে ম'রতে ব'সেছি, অতএব সে ভুল না ক'রে এস আমরা সেকালের পূর্ব্বপুরুষদের অনুকরণ করি, এমনতর একটা কথার নির্ব্বিচারে অনুসরণ ক'রলে মস্ত একটা ভুল করা হবে। একটা কথা ভুলে গেলে চ'লবে না যে—সাহেবরাও মানুষ, পূর্ব্বপুরুষেরাও মানুষ,

তাহ'লে না হয় একটা নূতন বা পুরাতন মানুষের দলের অনুকরণ ক'রে মানুষের মত একটা অভিনয় ক'রবার চেষ্টা করা যেত ! আমরাও যখন মানুষ, কারুর অনুকরণ ক'রে আমাদের প্রাণ আমাদের দেহকে সঞ্জীবিত ক'রে রেখেছি তাও নয়, কারুর দেখাদেখি আমরা সুখ দুঃখ অনুভব করি না ; মনোবুদ্ধ্যাদি পঞ্চকোষের এক আধটা আমাদের কম আছে তাও নয়, তবে কি কারণে আমরা নিজেদের অবাধ চিন্তাপথকে রুদ্ধ ক'রে, নিজেদের প্রাণশক্তিকে, স্বাধীন জীবনগতিকে ব্যাহত ক'রে, ফ্যাশানের খাতিরে অনুকরণ ক'রতে গিয়ে সং সাজ্‌তে যাব ?

আমরা সেকালের সত্যযুগকে প্রাণের সহিত শ্রদ্ধা করবো, সেই যুগের ঋষিদের হৃদয়ের পূজা দেব, তাঁদের গৌরবে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে ক'রবো—এসব হ'লো স্বতন্ত্র কথা ; আর তাঁদের যাগযজ্ঞ, সাধনপদ্ধতি, রীতি-নীতির বোঝা মাথায় ক'রে জীবনটা দুর্ব্বহ ভারগ্রস্ত করা বা তাঁদের শাস্ত্রের পুঞ্জ পুঞ্জ বিধি নিষেধের কাছে মাথা বিকিয়ে দেওয়া, এ হ'লো স্বতন্ত্র কথা। তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে তাঁরা যে সাধন ক'রেছিলেন তাকে

একটা বিশিষ্ট আকারে তাঁদের কাছে যেভাবে সত্য ফুটে উঠেছিল, আমরা শাস্ত্র মুখস্থ ক'রে, সেই সত্যের বড়াই ক'রলে লোকে আমাদের বড় ব'লবে না। যে সত্য যে ভাবে তাঁরা পেয়েছিলেন, সেই সত্যের উপর দাবী ক'রে চিরকাল পুরুষানুক্রমে পায়ের উপর পা দিয়ে নির্ব্বিবাদে তাই ভোগদখল ক'রতে থাক্‌বো, এত বড় একটা ফাঁকি প্রকৃতির আদালতে একান্ত অগ্রাহ্য।

পুরাতনের পূজা ক'রবো, পুরাতনকে শ্রদ্ধা ক'রবো সে বিষয়ে দুটো মত কোথাও নেই, থাকা উচিতও নয়। ভারতের ঋষিদের সাধনার বল, তাঁদেরই পুণ্যরক্তের ধারা বহন ক'রে আমরা কত কত যুগের ঝড়-ঝাপ্‌টা খেয়েও আজ বেঁচে র'য়েছি, এ কথা ভুলে গেলে আমাদের অস্থি-পঞ্জর যে এখনি ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে যাবে! তাঁদের সত্যানু-সন্ধান, তাঁদের তপস্যা, তাঁদের আর্জব, তাঁদের নিষ্ঠা, চির-দিনই আমাদের চোখের সাম্‌নে থেকে আমাদের বিরাট আদর্শকে জীবন্ত ক'রে রাখবে। কিন্তু তাই ব'লে তাঁদের জীবনযাত্রার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানগুলি, তাঁদের আচার-ব্যবহার তাঁদের আশা-ভরসা যাই নকল ক'রতে যাব, অমনি

আমাদের প্রাণের ভিতরের স্বপ্রতিষ্ঠ স্বয়ম্প্রকাশ দেবতাটির অপমান করা হবে। মানুষের প্রাণের যিনি প্রাণ, মনের যিনি মন, তাঁর ভাণ্ডার যে অফুরন্ত আর অনন্ত বিচিত্রতাময়। নিত্য নূতন নূতন রসের প্রকাশ ক'রে এই বিরাট সৌন্দর্য্যের হাটে নিত্য এমনি নূতন আর বিচিত্র শোভার বিকাশ ক'রছেন যে এই আনন্দের লীলার ভিতর এতটুকু এক-ঘেয়ে ভাব প্রবেশ ক'রতে পারছে না। তাই বলি ভাই, একটা নূতন কিছু দেখ্‌লেই শিউরে উঠে এ বিচিত্র খেলার যে আনন্দ তা থেকে বঞ্চিত হ'য়োনা। আমার যে হৃদয়-স্বামী সে যে চির নূতন—তাই তাঁকে পেয়েও পাওয়া হয় না। আর তাঁকে পাওয়া না পাওয়া যে মোটেই আমাদের হাতে নয়কো। তিনি যখন কৃপা ক'রে ব্যক্তিবিশেষ বা জাতিবিশেষের কাছে যতটুকু যে ভাবে প্রকাশিত হন, মানুষ তাঁকে ততটুকুই জান্‌তে পারে। তিনি হনুমানের কাছে যে ভাবে প্রকাশিত হ'য়েছিলেন, লক্ষ্মণ বা বিভীষণের কাছে সে ভাবে হন নি। আবার এদের সকলের কাছে যে রূপে আর যে ঐশ্বর্য্যে ব্যক্ত হ'য়েছিলেন, তার সঙ্গে গোপীদের কাছে প্রকটিত রূপৈশ্বর্য্যের কতই পার্থক্য! একই মূর্ত্তি,

শ্রীদামসুদাম দেখেছিল একভাবে, আর পঞ্চপাণ্ডব দেখেছিল আর এক ভাবে। এইরূপ প্রত্যেক মানুষের কাছে প্রকাশিত তাঁর লীলার মধ্যে একটা স্পষ্ট বিশিষ্টতা আছে; —একই সাধকের মনোমধ্যে নিত্য নূতন খেলা হিসাবে নিত্য নূতন বিচিত্র রসতরঙ্গের আবির্ভাব। যেমন ব্যষ্টির সাধনায় তিনি নিত্য নূতন তরঙ্গ তুলে সাধককে আনন্দের পুলক থেকে পুলকান্তরে নিয়ে যান, তেমনি আবার সমষ্টির কাছেও—সমাজ বিশেষ ও জাতিবিশেষ এবং বিশ্বমানবের কাছেও—যুগভেদে তাঁর অভিব্যক্তির রকম আলাদা আলাদা। মানুষ যেভাবে যতটুকু নিজ অন্তরকে বিকশিত উন্মুক্ত ক'রেছে, অন্তর দেবতা ঠিক সেইভাবে ততটুকুই নিজেকে প্রকাশিত ক'রেছেন।

দাদা, সবাইকে খুব হাঁক-ডাক ক'রে বল যে আজিকার মানুষের চেয়ে ভাগ্যবান মানুষ কোন যুগে জন্মগ্রহণ করেনি। আমার বলবার ধরণ-ধারণে বিদ্যাবুদ্ধির সংস্রব নেই; তাই তোমাদের কাছে অনুরোধ যে আগে তোমরা এই কথাটা মানুষকে বেশ ক'রে বুঝিয়ে বল, যে সৃষ্টি-ব্যাপারটা ক্রম-বিকাশশীল; কাল যত অগ্রসর হ'চ্ছে, সৃষ্টির মধ্যে

ভগবল্লীলার ঐশ্বর্য্য আর মাধুর্য্য ততই অধিক পরিমাণে প্রকটিত হ'চ্ছে। আরও বল, যে ঋষিরা কোনও একটা অতীত যুগবিশেষে অকস্মাৎ পথ হারিয়ে ধরায় এসে পড়েন নি, সকল যুগেই তাঁরা এসেছেন, আর বর্ত্তমান যুগের ঋষিরা যাঁরা এসেছেন বা আসবেন, তাঁরা পুর্ব্বগত ঋষিদের চেয়ে ঢের বেশী ভাগ্যবান। চিন্তা কি? দশবার ব'লে যদি না বোঝে, শতবার বল। যতক্ষণ না বোঝে, ততক্ষণ প্রেমপূরিত আকুলহৃদয় নিয়ে সকলের পায়ে ধ'রে ধ'রে বল, যে এই পূর্ণলীলার যুগে মানুষ অতি অল্প আয়াসেই ঋষিত্ব লাভের অধিকারী। ইতি—

তোমাদের বিশুদাদা।

(২)

দাদা, সেদিন ফরাসডাঙ্গার পান্নালালের সঙ্গে দেখা হোলো। পান্নালালকে মনে আছে ত? গত যুদ্ধের বাজারে সে রঙের আর লোহালক্কড়ের কাজে বেশ টাকা ক'রেছে। সেদিন বৈকালে হাতী-বাগানের মোড়ে দাঁড়িয়ে একটা ঝাড়ুদারের সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত ছিলাম। কি জন্যে তারা ধর্ম্মঘট ক'রে কাজ বন্ধ ক'রেছে, তাই অবাক্ হ'য়ে শুনছিলাম, আর ভাবছিলাম, ভারতে বোলশেভিজম্ প্রচার করবার জন্যে ইউরোপ থেকে গুপ্তচর আসবার কোনই দরকার নেই। ঝাড়ুদারের মুখে তাড়ির গন্ধ, চোখে একটা মস্ত কুছ-পরোয়ানেই গোছ ভাব; গোলাপী নেশার ঝোঁকে হাত মুখ নেড়ে, সে তার বেঁচে থাকবার অধিকার, ভোগ করবার অধিকারের কথা আমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছিল। পাথুরে কয়লার ধোঁয়ার মত বিবর্ণ একখণ্ড জীর্ণ বস্ত্রাংশে তার কটিদেশ আচ্ছাদিত এবং আর এক টুকরা মস্তকে জড়িত। বেশভূষা তার যেমনই হোক্ তাকে দেখে মনে হ'ল যে তার

ভেতরে ঠাকুর এখন ভোগমুখী ; ভোগ করাই এখন তার স্বধর্ম্ম। অনেকগুলো কথা বুকের মধ্যে এসে তোলাপাড়া ক'রতে লাগলো। ঝাড়ুদার ভায়াকে ভোগের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে দুটো কথা ব'লতে যাবো, অমন সময়ে পথের ধারে একখানা মোটর দাঁড়ালো, এবং তার ভেতর থেকে সাহেবী পোষাকে পান্নালাল নেমে এসে, "বিশুদাদা যে" ব'লে উচ্চহাস্য ক'রে আমার হাত ধ'রে গাড়ীতে তুলে নিলেন। পান্নালাল আফিস ক'রে বাড়ী ফিরছিলেন, হুস্ ক'রে আধ মিনিটের মধ্যে গাড়ী একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়ালো। বাড়ীর সাজসজ্জা আসবাব পত্র ঐশ্বর্য্যের পরিচায়ক। প্রিয় বন্ধুকে ভোগের মধ্যে নিমজ্জিত দেখে একটু কষ্টই হোলো।

পান্নালালকে নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে। স্কুলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জ্যোতির্ম্ময় ছিল তার মূর্ত্তি। বুদ্ধি ছিল তার ক্ষুরধার। বিনা পরিশ্রমে সে লেখাপড়ায় কৃতিত্ব দেখাতো ; কপালে, চোখে, মুখমণ্ডলে চিন্তাশীলতার স্পষ্ট ছবি আঁকা ছিল—রাজনীতি, সমাজ, ধর্ম্ম, সকল বিষয়েই তার নিজস্ব নূতন কথা বলবার ছিল ; বিস্ময়ে অবাক্ হ'য়ে

তার কথা শুন্‌তে হ'ত। তার হৃদয়টা ছিল আগ্নেয়গিরির মত; ভারতের দুঃখ দারিদ্র্যের কথা ব'লতে ব'লতে উন্মত্তের মত জ্ঞানশূন্য হ'য়ে প'ড়ত। সে সব কথা যাক্। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে তার সঙ্গে একবার হরিদ্বারে দেখা হয়। আমি তখন দেশভ্রমণে বেরিয়েছি, আর পান্নালাল তখন সন্ন্যাস নিয়ে গৈরিক ধারণ করে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেছে। হরিদ্বারের সেই প্রচণ্ডগতি শব্দময়ী গঙ্গার তীরে দু'জনে কয়েকদিন কাটিয়ে, তারপর আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। তখন আমি তাকে সন্ন্যাস পরিত্যাগ ক'রতে উপদেশ দিয়েছিলাম। ত্যাগের মধ্যে যে কাপুরুষতা আছে, তাই কয়েকদিন ধ'রে নানাবর্ণে চিত্রিত ক'রে তার সামনে ধ'রতাম। ভোগের মধ্যে ভগবানকে পাওয়াই হ'ল বীরত্ব আর এই যুগের বিশেষত্ব, এই কথা তার কাছে ভালই বোধ হ'য়েছিল, কিন্তু আমার কথায় সহসা গুরুদ্রোহী হ'য়ে সংসারে ফিরে আসতে সে তখন প্রস্তুত হয় নি। কিন্তু কয়েক মাস পরেই, সম্ভবতঃ বৈরাগ্যে বৈরাগ্যবশতঃ সে আবার দেশে ফিরে এসে ভোগৈশ্বর্য্যের পথে বেশ দ্রুতপদে চ'লেছে।

এখন আমি আবার কেমন ক'রে ভোগের নিন্দা ক'রে ত্যাগের মহিমার কথার অবতারণা ক'রবো; এই কথা ভাবতে ভাবতে জিজ্ঞাসা ক'রলাম "তারপর ভাই কেমন আছ, বল।"

সে যেন এই রকম একটা প্রশ্নের প্রতীক্ষাই ক'রছিল। আবেগভরে ব'লে উঠলো "আর থাকাথাকি ভাই, পুত্র-কলত্রাদির এবং ধনসম্পত্তির ঝঞ্ঝাটে নাস্তানাবুদ হ'য়ে আছি। ত্যাগে তৃপ্তি পাইনি, ভোগেও আনন্দ নাই; ওদুটোই ঝুটো। কর্ম্মফলই বল আর ভগবানই বল, একটা অদৃশ্য শক্তি যেন ঘাড় ধ'রে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। আমাদের হাতে ত কিছুই নেই, কেবল দেখে যাওয়া আর ক'রে যাওয়া, বাকিটা তাঁরি হাতে, তাই হাল ছেড়ে দিয়ে ব'সে আছি, যেখানে গিয়ে নৌকা ঠেকে।"

বুঝা গেল যে ভোগটা বন্ধুবরের এখনও তেমন বিরক্তি-জনক হয়নি, সেজন্য "হাল ছেড়ে দিয়ে" কোনমতে নিশ্চিন্ত আছেন। বললাম,—

"ঠিক ব'লেছ ভাই, ঐ অদৃশ্য শক্তি প্রচণ্ডবেগে নৃত্য ক'রতে ক'রতে লীলার ছলে জগৎসংসারে নিজেকে

প্রকটিত ক'রেছেন। তুমি, আমি, কেষ্ট বিষ্টু সকলেই ঐ শক্তির লীলার কেন্দ্রমাত্র। অজ্ঞাতসারে সকলেই ঐ শক্তির স্রোতে গা ভাসিয়েই চ'লেছে। কিন্তু ভাই, শক্তি-রূপী ঐ ঠাকুরটি এমনি কূটবুদ্ধি যে নির্ব্বিবাদে কাউকেই গা ভাসিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে দিচ্ছে না; প্রতিপদেই নাকে মুখে জল ঢুকিয়ে বেশ ঝটাপটি করিয়ে নিচ্ছে। সুখের তরঙ্গশীর্ষে উঠিয়ে আবার পরক্ষণেই দুঃখের ঘূর্ণী-পাকে চুবন খাওয়াচ্ছে।"

তীক্ষ্ণবুদ্ধি পান্নালাল একটু চুপ ক'রে রইল। বোধ করি গা-ভাসানোর ব্যাপারটা আর একটু ত'লিয়ে বুঝবার চেষ্টা ক'রছিল। আমি বল্লাম," কবিতার ছন্দে গা-ভাসানোটা শোনায় ভালই, বসন্তের হাওয়ায় গা-টা আপনি বেশ সটান ভেসেই যায় বটে, কিন্তু গন্ধময় বাস্তবের মধ্যে যখন কাল-বৈশাখীর ঝড় ওঠে, তখন বড় কষ্টেই ভাসে।"

পান্নালালের একজন বন্ধু রঙ্গরাজ সেই ঘরে প্রবেশ ক'রে একখানি চেয়ারে বস্‌লো। আমাদের পরিচয় সম্ভাষণাদির পর পান্নালাল বল্‌লো, "তবে কি তুমি ব'লতে চাও যে ত্যাগের মধ্যেই শান্তি আছে?"

আমি ব'ললাম, "না, আমি এমন কথা বলি না যে ত্যাগের মধ্যে শান্তি আছে বা ভোগের মধ্যে শান্তি আছে। সাধারণ জীবের জন্য এখনি সরাসরি শান্তির ব্যবস্থা কে ক'রে দেবে? যে বিরল সাধক শান্তিলাভ ক'রেছে, ত্যাগের কাঠিন্য বা ভোগের বিষাদময় অতৃপ্তি, এ দু'টোর কোনটাই তার মনকে স্পর্শ ক'রে অশান্ত করে না। বিনা সাধনায় মানুষ শান্তির অধিকারী হ'তে চায়। সুখ আর দুঃখের ঢেউগুলো কাটিয়ে সাধক চলে শান্তির পথে বটে, কিন্তু শান্তি লাভটা ঘটে' উঠা অত সুলভ নয়। আমরা চলেছি অশান্তি থেকে শান্তিতে, অল্প থেকে ভূমাতে, ব্যষ্টি থেকে সমষ্টিতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে; এই সবে গা ভাসিয়ে দিতে শিখ্‌ছি বটে। আর এই রকমে জ্ঞাতসারে আত্মসমর্পণ-মন্ত্রজপের প্রথম স্তরে এবং কিঞ্চিদ্দূর পর্য্যন্ত আমাদের মনকে নিশ্চয় ত্যাগমুখী রাখতে হবে।

"আমার একটা কথা আছে" এই ব'লে রঙ্গরাজ গম্ভীর-ভাবে আরম্ভ ক'রল, "ত্যাগটা এ যুগের ধর্ম্ম নয়। সেকালের বুদ্ধ ও শঙ্করের ত্যাগ-ধর্ম্ম এখন বাতিল হ'য়ে গিয়েছে।

রাখেন না ? নূতন একটা যুগ আরম্ভ হ'য়েছে ; পুরাণো যুগের কোন কথাটাই বাজারে আর টিকতে পারবে না। প্রত্যেক মানুষ এখন নিজ ব্রহ্মস্বরূপ বুঝতে আরম্ভ করেছে। আত্মসমর্পণ ক'রে পূর্ণযোগবলে পূর্ণভাবে ভোগানন্দকে উপলব্ধি করবার শুভদিন এসেছে। এ যুগে সকলেই অবতার, সকলেই ভগবান। ভোগানন্দে ডুবে থাকবার জন্যই পরমাত্মার এই সৃষ্টি রচনা ; তাই এ যুগে মানুষ তুরীয়ে অবস্থিত হ'য়ে, ভগবানের যন্ত্রস্বরূপ হ'য়ে ব্রহ্মানন্দ ও কামিনীকাঞ্চন সম্ভোগানন্দ একযোগে উপভোগ ক'রে পূর্ণবৃন্দাবন লীলাকে ধরায় প্রকটিত ক'রবে। এমন দিনে আপনার ত্যাগের কথা শোনবার মানুষ কই ?" *

শুনে আমার গাটা একটু গরম হ'য়ে উঠলো। বার কতক ইষ্টমন্ত্র জ'পে সেটুকু সাম্‌লে নিলাম, এবং একটু হেসে ব'ল্লাম—

"দাদা, বুঝলাম আপনার কথাটা। ভবঘুরে বিশ্বম্ভর-চক্রবর্ত্তী আর কিছু জানুক আর নাই জানুক, বাজারের

---

* এই চিঠি আধুনিক ভোগবাদি-প্রকাশিত সাহিত্যের প্রতিবাদ।

খবরটা রাখে। তবে কি জানেন দাদা, বাজারের সব খবর গুলো নিয়ে প্রকাশ্যভাবে আলাপ-আন্দোলনটা ক'রতে বড় একটা প্রবৃত্তি হয় না। ভারি হালকা আর ভারি গোঁড়া আমাদের দেশের লোক। আলোচনা বিচার এগুলো এত ভাল জিনিস, কিন্তু আমাদের ধাতে যেন সয় না। ধীরভাবে একটা তত্ত্ব বা মতের আলোচনা করা, বিদ্বেষবর্জ্জিত হ'য়ে কেবল সত্যানুসন্ধানে ব্যাকুল হ'য়ে, সংযতভাষায় সদালাপ করাটা আমাদের প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তত্ত্ব নিয়ে তর্ক বিচার ক'রতে গিয়ে, কেবল সুপ্ত বিদ্বেষ-বৃত্তিকে জাগ্রত করা হয় মাত্র। প্রতিপক্ষের সমালোচনার ভাষা একটু কঠিন হ'য়েই থাকে—চতুর প্রচারক তাতে অধীর হন না। বিষয় যেখানে হালকা, সেখানে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ (বিদ্বেষবর্জ্জিত হ'লে) শোভা পায় বটে ; কিন্তু ব্রহ্ম, তুরীয়, পূর্ণযোগ, ত্যাগভোগাদি যখন আলোচনার বিষয় হয়, তখনও যদি জিহ্বাকে শ্লেষে শাণিত করবার প্রয়োজন বোধ হয়,—তা হ'লে ঐ জিহ্বার অধিকারিগণের ভগবৎ-প্রেরণা, তুরীয়াদেশ ও পূর্ণযোগাদির বার্ত্তাকে মানুষে স্বভাবতই সন্দেহের চক্ষে দেখে না কি? বাঙ্গালীর রস-

বোধটা একটু বেশীই ব'লে মনে হয়, সে কারণ রসিকতাটাই অনেক সময়ে বিস্তাবুদ্ধির উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তিরূপে কেটে যায়। রামকে হনুমদ্বংশনায়ক, কৃষ্ণকে চলাচলি ও রক্তা-রক্তির গুরু, শ্রীমান কৃষ্ণচন্দ্র ও গৌরাঙ্গকে নেড়ানেড়ীর স্রষ্টা ব'লে বুদ্ধদেবের দাঁতের কথা নিয়ে বা স্বামীজির চটিজুতার উল্লেখ ক'রে মুখ না ভেঙ্গিয়েও বিশ্বাত্মবোধ প্রচার করা যায়, এবং তাতে অনাবশ্যক লোকের মনে ব্যথাও লাগে না। অনেক সময়ে শ্লেষ আর রসিকতা যুক্তির স্থান পূরণ ক'রে থাকে! তাই, রাগ কোরো না, আমার কথাগুলো যদি একটু কড়াও হ'য়ে যায়, তাহ'লেও রাগ না ক'রে ক্ষমাই কোরো—এই যে মায়ার মত দেখ্‌ছে জগৎটা, এটা এমনি একটা পাহাড়ের মত শক্ত নিরেট সত্ত্বা দিয়ে গঠিত, যে এর মধ্যে এতটুকু ফাঁকির ছুঁচ গলে না। যে সত্য আমরা (আমরা মানে তোমরাও) পেয়েছি তাকে অশেষরকমে ঠুকে বাজিয়ে তবে মানুষ গ্রহণ ক'রবে, যদি সত্যই পেয়ে থাকি তার অনুভব ক'রে থাকি, তবে তা তীব্রবেগে সোজা অশ্বমেধের ঘোড়ার মত ছুটিয়ে দেব আর তা দিগ্বিজয় ক'রবেই। যদি সত্যই পেয়ে থাকি তবে

ত তা প্রহ্লাদের মত অমর—জলে, আগুনে, হস্তিপদতলে ফেলে মারবার জন্যে কংসগণ ত চেষ্টান্বিত হবেই। ভয় পেলে চ'লবে কেন? যাদের সর্ব্বংসহ হ'তে হবে, সমালোচনে, বিশ্লেষণে চঞ্চল হ'লে তাদের মোটেই চ'লবে না—এই কথা আমরা যতই মনে রাখ্‌বো, ততই আমরা পরস্পরের সহায়ক হ'য়ে বিশ্বনাথের লীলার যন্ত্র হবার যোগ্য হ'তে পারবো। বিশেষ অবতারকল্প মহাপুরুষগণের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য শ্লেষযুক্ত রসাভাষের সৃষ্টি হয় নি। সে কথা থাকুক। ত্যাগ আর ভোগের কথাটা যখন পাড়লে, তখন একটা মীমাংসার চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত। বিষয়টা বড়ই, আমি সংক্ষেপে দু'একটা কথা বলব মাত্র।

"ব'লছিলাম যে সাধারণ রাজসিক মানুষ অথবা প্রথম স্তরের সাধকের কর্ত্তব্য মনকে সর্ব্বদা ত্যাগমুখী ক'রে রাখা। ত্যাগের অনুশীলনের জন্যে আমরা মঠের ভিতরে পলায়নের বিরোধী। এই গৃহস্থাশ্রমটাকেই মঠ ক'রে তুলতে হবে৭. ভোগের উপচারে বেষ্টিত হ'য়েই থাক, আর ত্যাগের ভস্মই গায়ে মাখো, মনটাতে ত্যাগের ধুনী সতত জাগিয়ে রাখতে হবে। ভোগ্য বস্তুর মধ্যে বাস ক'রে, ও

ত্যাগ আর ভোগের মধ্যে স্পষ্ট একটা দাঁড়ি টেনে ভোগের নেশা থেকে তফাৎ থাকতে হবে। এই কর্ম্মকুশলতার নামই যোগ! জলের মধ্যেই যেমন সাঁতার শিখ্‌তে হয়, ভোগের মধ্যেই তেমনিই ত্যাগ শিখতে হয়। জলের ধর্ম্ম ডুবিয়ে দেওয়া, ভোগেরও ধর্ম্ম ডুবিয়ে দেওয়া। মানুষ স্বভাবতই ভোগমুখী, আর আমাদের ধারণা যে ত্যাগধর্ম্ম নহে, বরং এই ভোগমুখিতাই অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়ে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য এই উভয় প্রদেশকেই আজ এই ভাব-বিপ্লবের মুখে নিয়ে এসেছে। বিষয়ের জলে এই ভোগাবর্ত্তন বাসনাগুরুভার জীবগুলিকে ভাসিয়ে রাখতে হ'লে, কৌশলে প্রতিপদে ভোগের চক্রগুলিকে এড়িয়ে চ'লতেই হবে।

"বাসনার তাড়নায় মানুষ যখন 'ত্রাহি ত্রাহি' ডাক ছাড়ে, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের সাধনা আরম্ভ হয়। বাসনা থেকে মুক্তিলাভ না ক'রে শান্তি বা আনন্দের অধিকারী হবার কোন উপায় অন্ততঃ আমাদের জানা নেই। যুগান্ত-সঞ্চিত এই বাসনারাশি প্রকৃতির নিয়মে বড় মন্থর গতিতে একটি একটি ক'রে উচ্ছিন্ন হয়; এই জন্যই শাস্ত্রে সাধনার পথকে ক্ষুরধার তুল্য নিশিত বলা হ'য়েছে। নবযুগের

মহাবির্ভাব বার্ত্তা আর পূর্ণযোগ ও তুরীয়ের বার্ত্তা ঢাকযোগে ঘোষিত হ'চ্ছে ব'লেই আমরা হুজুগে পড়ে কিছুতেই স্বীকার ক'রে নিতে পারছি না যে, সকল কামনাকে জয় বা দগ্ধ করবার পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীভগবানে অর্পণ করবার পূর্ব্বে "রমণীর পীনোন্নত পয়োধরে যে সুধা আছে," সেই সুধার মধ্যে ব্রহ্মানন্দ ভোগের আস্বাদ পাওয়া যেতে পারে।

বিষয়কে পরিহার ক'রে কোপীন এঁটে মঠে বা জঙ্গলে গেলেই বাসনা রাশি আমাদের পশ্চাদ্ধাবনে বিরত হয় না, এবং আত্মসমর্পণ ক'রলাম, বল্লেই অমনি "মুক্ত ভাবে বিষয় ভোগ করবার আদেশ তুরীয় থেকে নেমে আসে না।" অজ্ঞানবশতঃ বিষয়টা যদি আমাদের সাধনার পথে বাধাই হ'য়ে দাঁড়ায়, "তাহ'লে জ্ঞান ও শক্তিকে বৃদ্ধি করিয়া" ঐ বাধাকে অতিক্রম ক'রবার ব্যবস্থা দেওয়া হ'য়েছে। উত্তম কথা; কিন্তু জ্ঞান আর শক্তিকে উপযুক্তভাবে বৃদ্ধি করাটা কি এতই আমাদের মুঠোর মধ্যে? মনে কর একজন নারী যদি এসে আমাদের সাধনপথে বাধারূপে দাঁড়ায়, তাহ'লে নারীরূপাত্মক ঐ বিষয়টিকে কাপুরুষের মত বর্জ্জন না ক'রে

জ্ঞান ও শক্তি দরকার মত বাড়িয়ে নিয়ে, তার মধ্যে ব্রহ্মানন্দের অন্বেষণটাই কি পূর্ণ-লীলার অঙ্গীভূত? "ক্ষুদ্র ভোগের মধ্য দিয়াই মহত্তর ভোগের অধিকারী হইতে হয়" এই যুক্তির সাহায্যে সাধনার পথটাকে বেশ কুসুমাস্তীর্ণ, লোভনীয়, মজাদার ক'রে চিত্রিত করা হ'চ্ছে, কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে এ সকল তথ্য নিতান্তই দুর্ব্বোধ্য, হয় আমাদের পোড়াবুদ্ধির দোষ স্বীকার ক'রতে হয়, না হয় আপনাদের ভাব বা ভাষার মধ্যে একটা উৎকট রকমের ভ্রান্তি বা অস্পষ্টতা আছে ব'লে সন্দেহ হয়। কিন্তু নিজের বুদ্ধিটাকে অতটা খেলো ব'লে বোধ ক'রতে হ'লে যতটা বিনয় বা আত্মসমর্পণ আবশ্যক তারও অভাব। সে কারণ আমি শ্রীবিশ্বম্ভর দেবশর্ম্মা খোশ মেজাজে বাহালতবিয়তে প্রত্যেক ভোগপন্থীকে এবং বাঙ্গলার সকল মহাপ্রাণ সুধী ও সাধক চরণে ধ'রে এই তত্ত্বের সম্যক বিচার ও মীমাংসার জন্য আহ্বান ক'র্‌ছি।

"উপরে ক্ষুদ্র ভোগ আর মহত্তর ভোগের যে কথা উদ্ধৃত হ'লো তার কি এই মানে যে সাধক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগ থেকে আরম্ভ ক'রে ক্রমে উপরদিকে উঠতে উঠতে ক্রমে বড় বড়

ভোগের অধিকারী হ'তে হ'তে অবশেষে নবযুগের এক সুপ্রভাতে মহত্তম ভোগ ব্রহ্মপদকে প্রাপ্ত হ'য়ে কৃতার্থ হবে। এই যদি মানে হয়, তাহ'লে আমাদের পাড়ার গোব্‌রা ত সাধনার প্রশস্ত পথই অবলম্বন ক'রেছে, সে আট বৎসর বয়সেই (পূর্ব্বজন্মের সাধনা নিশ্চয় ছিল) সিগারেট ভোগ ক'রতে শিখেছিল, দশ বছরে স্কুলের দরোয়ানের সঙ্গে যোগ-সাজসে সিদ্ধি ভোগ ক'রতে লাগ্‌লো; তার পর বারোতে গাঁজা ভোগ; ষোলতে কারণ-বারি-সম্ভোগ; খুব তীব্র সাধনা। এখন শ্রীগোবর্দ্ধন গোস্বামীর অষ্টাদশ-বার্ষিকী লীলা চ'লেছে, এবং ভোগের বস্তুসকল আরও বৃহত্তর হ'য়েছে। এই রকমে শ্রীমান ঘৃণা লজ্জা ভয় সব ত্যাগ ক'রে সাধনে রত থাকায় শরীরটি শুষ্কশীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে এবং আমাদের আশা আছে যে তার পরম ভোগ্যবস্তু লাভ বা কৃষ্ণ প্রাপ্তি অতি সত্বরই ঘট্‌বে।

এ কথাটার ভেতরে কিন্তু সত্য আছে। সেটা হ'চ্ছে এই যে ভোগ ক'রতে ক'রতেই আমাদের ভোগে বিতৃষ্ণা আসে, আর ভোগে বিতৃষ্ণা এলেই মানুষ ক্রমশঃ ত্যাগের পথে আকৃষ্ট হ'তে থাকে। প্রত্যেক মানুষই, জ্ঞাতসারেই

হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক. এই বিষয় ভোগের ভেতর দিয়েই বাসনার ক্ষয় ক'রতে ক'রতে, এই বিষয়ের মোহ হ'তে নিষ্কৃতি পাবার পথে চ'লেছে, নিজ স্বরূপে আত্মস্থ হবার পথে চ'লেছে।

ভোগের মধ্যে লুকানো থাকে দুঃখের বীজ, ভোগের মাত্রাটা যত বাড়তে থাকে, এই দুঃখের বীজও তত দ্রুত অঙ্কুরিত হ'য়ে বিশাল বৃক্ষে পরিণত হয়; এদিকে বিষয়কে পুনঃ পুনঃ ভোগ ক'রতে ক'রতে একটা অতৃপ্তিবোধ, একটা অবসাদ বুদ্ধি এসে পড়ে। তখনও মানুষ সহজে ভোগাবস্তুকে ত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত হয় না। ভোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দুঃখগুলোকে তখন নানাকৌশলে এড়িয়ে ভোগ্য বস্তুকে আরও ভোগ করবার চেষ্টা চ'লতে থাকে। এই রকমে দুঃখটুকু বাদ দিয়ে সুখের অন্বেষণে ব্যর্থপ্রয়াস ক'লে তখন বিচার আসে,—সুখ ও দুঃখ, এই দুইয়েরই পারে যাবার জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জেগে ওঠে। এই বিচারটা যতই পেকে আসে, আকাঙ্ক্ষাটা ততই প্রবল আর গভীর হ'তে থাকে; সুখের পশ্চাতে অনিবার্য্য দুঃখের মূর্ত্তিটা বুদ্ধির মুকুরে যখন স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে ওঠে, তখন মন

আর সুখের পিছনে ছুটবার জন্যে লালায়িত হয় না। কিন্তু বহুজন্মের সঙ্গী এই বিষয়; সুদীর্ঘ অভ্যাসের ফলে ভোগাসক্তিটা সারা মনকে তখনও বেশ আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। সাধনার যখন আরম্ভ, তখন বুদ্ধিটা ভোগের অসারতা বুঝতে আরম্ভ ক'রেছে বটে, কিন্তু মনটা তখনও পূর্ব্বসংস্কারের কঠিন নিগড়ে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধাই র'য়েছে; আর এই সংস্কারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ত্যাগই ব্রহ্মাস্ত্র। হিসাব মত বিচার ক'রতে গেলে, ভোগাসঙ্গের সংস্কারটা যেমন সুদীর্ঘ কাল ধ'রে ধীরে ধীরে জমে ওঠে, বিপরীতমুখী ত্যাগের সংস্কারটাও তেমনি দীর্ঘ কাল ধ'রে ধীরে ধীরে স্বভাবগত হওয়াই স্বাভাবিক। হয়ও তাই; নিতান্ত ভোগাসক্ত, প্রাকৃত মানুষ যখন বিষয়ের মধ্যে পুরোমাত্রায় নিমজ্জিত, তখন থেকেই অজ্ঞাতসারে ত্যাগ সাধনার সূত্রপাত হয়; সুখভোগটাকে নিরঙ্কুশ করবার জন্যে সকল মানুষকেই প্রতিপদে ত্যাগের আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে হয়। কিন্তু জ্ঞাতসারে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্যে চেষ্টিত হ'য়ে যখন আমরা প্রকৃত সাধনা আরম্ভ করি, সদ্‌গুরুরূপী ভগবানের হাতে যখন আত্মসমর্পণ ক'রতে শিখি, তখনই

শ্রীশিকৃপার লীলার দিকটা আমরা স্পষ্ট অনুভব করি, কৃপার মাহাত্ম্যে,সদ্‌গুরুদত্ত নামের শক্তিতে তখন যেন আমরা চ'লে যাই হিসাবের বাহিরে। পাহাড় প্রমাণ ভোগের সংস্কারকে ত্যাগ করবার জন্যে যে বিপুল ও সুদীর্ঘ ত্যাগ সাধনের আবশ্যক হওয়া উচিত, অত্যল্প কালের মধ্যে, স্থায়ের, নিয়মের মর্য্যাদাকে অটুট রেখে অতি অদ্ভুত কৌশলে তিনি আমাদিগকে এই দুস্তর সংস্কারসাগরের পরপারে নিয়ে যান।

"অতএব সিদ্ধান্ত ওই যে প্রকৃত সদ্‌গুরুর কৃপালব্ধ ভাগ্যবান সাধককেও প্রথম অবস্থায় মনকে ত্যাগমুখী ক'রে রাখতেই হয়। সিদ্ধির উপায়রূপে ত্যাগের আশ্রয় না নিয়ে, যদি আমরা বলি যে "এই সৃষ্টিটা ব্রহ্মেরই আত্মবিস্তারের ফল, ব্রহ্মের সহিত বিষয়ের একান্ত বিরোধী কোন সম্বন্ধ নেই," আর এই ব'লে হুইস্কির বোতলের ভেতর ব্রহ্মের যে আত্মবিস্তার, সেটাকে ত্যাগ না ক'রে ভোগ ক'রতে অগ্রসর হই, তা হ'লে লিবার-অ্যাবসেস্‌রূপী আত্মবিস্তারের উপলব্ধির জন্যও প্রস্তুত থাকতে হয়।"

আমার এই ভাষণটা পাছে আরও লম্বা হ'য়ে পড়ে, বোধ হয় এই আশঙ্কা ক'রে রঙ্গরাজ ব'ল্লে, "কথাটা একটু

জটিলই। এ বিষয়ে সময়ান্তরে আরও আলোচনা করা যাবে। শ্রুতিপুরাণাদি শাস্ত্রের এবং কৃষ্ণবুদ্ধাদি-রামকৃষ্ণ পর্য্যন্ত সকল অবতার ও মহাপুরুষগণের মুণ্ডপাত ক'রে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান ক'রতে বিস্তর দুঃসাহসেরই প্রয়োজন হয় বটে। তবে আমার মনে হয় কি জানেন, ভারতে এখন ভোগবাদটাকে প্রচার করবার একটা উপযোগিতা আছে।"

আমি ব'ল্লাম, "এক হিসাবে উপযোগিতা আছেই, নইলে প্রচারিত হ'ত না। ভারতের তমসাচ্ছন্ন জনসাধারণকে রাজসিক ক'রে তুলতে হ'লে, ভোগ করবার আকাঙ্ক্ষাটা তাদের মধ্যে জাগিয়ে তুলতেই হবে। যারা তামসিক, তারা প্রকৃতিবশেই, ভোগের ভিতর দিয়েই রজোমুখী হ'চ্ছে। দুর্ভাগ্যবশতই হোক, সৌভাগ্যবশতই হোক, সাহিত্যের ভেতর দিয়ে যে প্রচার, সেটা তাদের কাছে পৌঁছায় না।"

রঙ্গরাজ—"এ রকমের উপযোগিতা বা অনুপযোগিতার কথা থাক, আচ্ছা, এই সৃষ্টিলীলার মধ্যে ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ,

আমি—"আছে। দ্বন্দ্বাতীত গুণরহিত অবস্থাটাকে উপলব্ধি ক'রে আবার এই দ্বন্দ্বান্বিতা গুণময়ী সৃষ্টিলীলার মধ্যে যখন ফিরে আসা যায়, তখন এই সৃষ্টির প্রত্যেক রসটি ব্রহ্মানন্দেরই রস ব'লে অনুভূত হয়। চরম সিদ্ধির পরের অবস্থাটা, আর হাতে খড়ির অবস্থা, এই দুটোকে একযোগে তাল পাকালে যে বিভ্রাট উপস্থিত হয়, তাকে সাধন বলে না, তার নাম আধ্যাত্মিক dyspepsia.

"এ সব ছাড়াও, ভেবে দেখবার আর একটা কথা আছে। বহুকাল ধ'রে ত্যাগটা আমাদের দেশে ধর্ম্মসাধনের মহান্ আদর্শ ব'লে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রে আসছে। সাধনা মানেই যেন কৌপীন, গৈরিকবস্ত্র, মঠ, প্রব্রজ্যা, দণ্ড কমণ্ডলু ইত্যাদি। এই ভাবের বিরুদ্ধে এখন প্রতিক্রিয়া চলেছে। এ যুগে আমরা এই সংসারের ভেতরেই ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ আদর্শটাকে প্রতিষ্ঠিত দেখ্‌তে চাই। এক একটা ভাবের গোঁড়ামি দ্বারাই সাধারণভাবে মানুষের জীবন পরিচালিত হ'য়ে থাকে। যখন ত্যাগকে বড় করবার দরকার বোধ হ'য়েছিল, তখন সংসারটাকে মায়া ব'লে উড়িয়ে দেওয়া হ'ত, বিষয়টাকে বিষতুল্য পরিহার করবারই উপদেশ দেওয়া

হ'ত এবং নারীকে নরকের দ্বার পর্য্যন্ত ব'লতে মুখে বাধেনি। আবার আজকের দিনে সংসারটাকে সত্য বলতে গিয়ে যারা এটাকে মায়া ব'লত, তাহাদিগকে গণ্ডমূর্খ ব'লে লাঞ্ছিত করা হ'চ্ছে, ত্যাগের পিতৃশ্রাদ্ধ ক'রতে গিয়ে, ভোগের গুণগানে অশেষ উৎসাহ প্রকটিত হ'চ্ছে; "নারীর মাহাত্ম্য" "নায়ক নায়িকা," সম্বাদের কথা ব'লতে গিয়ে নবীন সাধকের দুই কষ বেয়ে লালা নির্গত হ'চ্ছে। এর ফলে হবে কি? দু একশো বছর যেতে না যেতে আবার ষোড়শোপচারে ভোগের বাপের শ্রাদ্ধের ধুম প'ড়ে যাবে। অসংখ্য দেবদেবীর মন্দিরে গিয়ে যখন ধর্ম্মের নামে কুকর্ম্মের বেজায় প্রাদুর্ভাব হ'য়ে উঠলো, তখন বৌদ্ধধর্ম্ম এসে কর্ম্মতত্ত্ব ব'লতে গিয়ে দেবদেবীগুলোকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভগবানেরও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ক'রে তবে নিশ্চিন্ত হ'য়েছিল। সেদিন নদীয়ায় ন্যায় বিচার আর শুষ্ক জ্ঞানের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া হ'য়েছিল, তার ফলে জ্ঞানটাকে বহুদিন কোনঠেসা হ'য়ে থাকতে হ'য়েছিল। আমরা বলি ত্যাগের বিরুদ্ধে বা ভোগের বিরুদ্ধে লাঠি ধ'রে আবার ঐ রকম একটা ভুল এবারে আর ক'রব না। ত্যাগ

বা ভোগের জন্যে একটা উৎকট প্রয়াসের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নেই। যে বস্তুর ত্যাগ রামের পক্ষে শ্রেয়, সেই বস্তুর ভোগই শ্যামের পক্ষে শ্রেয়। প্রত্যেক মানুষের সাধনের পথ এবং অভিজ্ঞতা ভিন্ন ভিন্ন। আমাদের প্রত্যেকের পশ্চাতেই আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মরাশি নির্ম্মম মহাজনের মত লগুড়হস্তে পাওনা আদায় করবার জন্যে ছুটেছে। কখনও ত্যাগের মধ্য দিয়ে কখনও ভোগের মধ্য দিয়ে আমরা ঋণ পরিশোধ ক'রতে ক'রতে চলেছি মাত্র। ত্যাগ ক'রবো বা ভোগ ক'রবো ব'লে বৃথা আস্ফালন। ভগবানের কৃপাকে এবং তাঁর প্রকট বিগ্রহ শ্রীগুরুকেই আমরা সার অবলম্বন ক'রেছি। আমরা জানি, তাঁর ইঙ্গিত মতে প্রাক্তনরূপী ঐ মহাজন নিতান্ত নরমসুরে মোলায়েমভাবে তার ঋণ আদায় ক'রবে, এবং সাবেক দেনার আদায় নিতে এসে পুনরায় নূতন ঋণে ফাঁসিয়ে যেতে পারবে না। ত্যাগের দিকে বা ভোগের দিকে দৃষ্টি করবার আমাদের হুকুম নেই, ওদিকে মনোযোগ দেবার আমাদের অবসর থাকাই উচিত নয়। অতএব চতুর সাধক সেই, যে ভোগ করবার সময়, ত্যাগমুখী অর্থাৎ অনাসক্ত হ'য়ে ভোগ করে, এবং ত্যাগ

করবার সময় ত্যাগবুদ্ধি-রহিত হ'য়েই ত্যাগ করে। চরম কথা এই যে সদ্‌গুরু প্রদত্ত সাধনের এমনি মহিমা যে প্রবৃত্তিকে বলপূর্ব্বক দাবিয়ে রেখে কিছু ত্যাগ করবার দরকার হয় না; সাধনার গুণেই (ইহারই নাম কৃপা) আসক্তি সকল কিঞ্চিৎ প্রয়াসেই আপনি সহজভাবে খ'সে যায়।

পান্নালাল খুব নিবিষ্টচিত্তে আমাদের কথাবার্ত্তা শুনছিল। সে ব'ললে, "ত্যাগ ভোগ এ সব বুদ্ধির বিভ্রম। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুই একমাত্র সার বস্তু।" তাকে ত্যাগ ক'রতে উপদেশ দেবার জন্য আমার যে লোভ হ'য়েছিল, সেটাকে সংযত ক'রলাম। এই ন্যাংটা ভবঘুরের চেয়ে সে বেশী ত্যাগী কি না তাই বা কে জানে? ইতি

দাদা, সেদিন দাদাম'শায়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে মাতুলালয়ে গিয়েছিলাম। যখন মাতুলালয়ে পৌঁছিলাম, তখন দাদাম'শাই বৈঠকখানার ফরাশে একটা বড় তাকিয়া ঠেস দিয়ে ব'সে আছেন, ডান-হাতে গড়গড়ার নলটি মুখে সংলগ্ন ক'রে রেখেছেন, আর মাঝে মাঝে তাতে মৃদুমন্দ টান দিচ্ছেন। সাম্‌নেই আমার মাতুলম'শাই ব'সে একখানা সাময়িক পত্র প'ড়ে দাদাম'শায়কে শোনাচ্ছেন। ফরাশের ওপর কয়েকখানা মাসিক ও দু'একখানা সাপ্তাহিক দৈনিক প্রভৃতি প'ড়ে র'য়েছে। "দাদাম'শায়" ব'লে তাঁকে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে প্রণাম ক'রলাম। দাদাম'শায়ের দৃষ্টি ক্ষীণ হ'লেও তিনি গলার আওয়াজে আমাকে চিন্‌লেন, এবং "দাদা এস, ভাই এস" ব'লে আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে, মাথায় গালে হাত বুলিয়ে আদর কর্‌তে লাগলেন।

দাদাম'শায়ের বয়স পঁচাত্তর হ'য়েছে। দৃষ্টি ক্ষীণ হ'লেও প্রাণটা সতেজ আছে। দেশের কোথায় কি হ'চ্ছে, কে কি ব'লছে, আমার মাতুলম'শায় প্রত্যহ

তাঁকে কাগজ প'ড়ে শোনান। আমি ব'ললাম, "মামা, থামলেন কেন? দাদাম'শায়কে কি পড়ে' শোনাচ্ছিলেন, পড়ুন না, আমিও শুনি।" দাদাম'শায় ব'ললেন, "থাক ভাই, তুই এসেছিস, তোর সঙ্গে দুটো মনের কথা কই" এই ব'লে একটু মনোযোগ সহকারে ঘন ঘন নলে টান দিয়ে ব'ললেন, "বুড়ো দাদাটা র'য়েছে, এক আধবার খবরটা নিতে হয়। আর ভাই ক'টা দিনই বা। তোরা সব কাছে কাছে থাক্‌লেই যেন লাগে ভাল।" তাঁর কথায় আমার মনটা বেজায় নরম হ'য়ে গেল, ভাবলাম, সত্যি ত, দাদাম'শায় আর ক'দিনই বা আছেন। তিনি চ'লে গেলে ত এত আদর এত ভালবাসা এ পৃথিবীতে মাথা খুঁড়লেও যে আর কোথাও খুঁজে পাব না। তা'ছাড়া দাদাম'শায়ের আর একটা বিশেষত্ব আছে, যা তোমরা সারা দেশটা খুঁজে কোথাও পাবে কি না সন্দেহ। বয়সের গুণে তিনি যে শুধু পুরাণো অভিজ্ঞতার খনিবিশেষ, কেবল তাই নয়; পৃথিবীতে যে একটা নূতন যুগের সূত্রপাত হ'চ্ছে সেই নূতন যুগের ডাকেও তাঁর সজাগ প্রাণটা পুরোমাত্রায় সাড়া দেয়।

এমন শ্রদ্ধাবান বুড়োমানুষ সত্যি সত্যি আজকার দিনে বিরল। আমি ব'ললাম,—

"দাদাম'শায়, আপনি অমন কথা ব'লছেন কেন। আপনার চিন্তা শক্তি এখনও যে-রকম প্রখর র'য়েছে, তাতে আপনার যাবার এখনও বিলম্ব আছে ব'লেই মনে হয়।"

দাদাম'শায় ব'ল্লেন, "না ভাই আর বেশী দিন থেকে কাজ নেই। একেবারে অথর্ব্ব হ'য়ে পঙ্গু হ'য়ে পড়বার আগেই যেন যাই, ভগবানকে তাই জানাস্।"

আমি কথাটাকে চাপাদিয়ে ব'ললাম, "কল্‌কেটা পাল্‌টে দিই, ওটাতে আর কিছু নেই।" তামাক সাজতে সাজতে ব'ললাম, "আচ্ছা দাদাম'শায়, আপনাদের সেকালে কি বিশ্বাত্মবোধ ব'লে কোন জিনিস ছিল না?"

দাদাম'শায় ব'ললেন, "আজকাল বিশ্বাত্মবোধ, বিশ্ব-মানবের ঐক্য প্রভৃতি খুব জমকালো গোটাকতক কথায় তোরা যেমন বাজারকে গরম ক'রে তুলেছিস্, আমাদের কালে ভাই, সে রকম কিছু একটা ছিল না। 'বিশ্বাত্ম-

দিতে পারিস্ তাহ'লে না হয় ভেবে দেখি, সেকালে ওরকম একটা কিছু ছিল কি না। তবে সেকাল আর একালের মধ্যে একটা স্পষ্ট প্রভেদ এই দেখতে পাই, যে সেকালে আমরা বড় বড় কথার ধার কমই ধারতাম কিন্তু প্রাণটা আমাদের যেন বড়ই ছিল; আর একালে তোদের কথার দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ খুব বেড়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু প্রাণটা যেন ছোট হ'য়ে গিয়েছে। কবিতার ভেতর বেশ একটা বিশ্ব-প্রেমের ঝঙ্কার উঠেছে বটে, কিন্তু একালের মানুষের প্রাণের ভেতর প্রেমের এতই অভাব যে মুখের হাসিটি পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেছে। বড় বড় কথার ইন্দ্রজাল রচনা ক'রে মানুষকে তাক্ লাগিয়ে দেওয়া—এবিদ্যার আমদানি হ'য়েছে পশ্চিম থেকে। ইংরাজ যখন এদেশে এল, তখন স্বাধীনতা, সাম্য, সভ্যতা, বিজ্ঞান, প্রভৃতি সম্বন্ধে খুব লম্বাচৌড়া কথা আমাদের শোনাতে লাগলো। নিতান্তই যেন ভারতের দুঃখশোকে অভিভূত হ'য়ে, কেবল ভারতেরই কল্যাণের জন্য, নিঃস্বার্থ বৈরাগীর মত এই বিশাল সাম্রাজ্যের গুরুভার তারা নিজের মাথায় তুলে নিল। গত শতাব্দীতে ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন জাতিগুলোর মধ্যে মৈত্রী

ও শান্তি স্থাপনের জন্য বড় বড় বৈঠকের যত বড় বড় কথার ঝঙ্কার হ'তে লাগলো, পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষ; কলহ আর যুদ্ধবিগ্রহের ঘটা ততই বাড়তে লাগলো। অবশেষে যখন বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের উচ্ছ্বাসটা খুবই উথলে উঠতে লাগলো, তখন দেখা গেল যে সমস্ত জাতি-গুলোই একটা জগদ্ব্যাপী রণরঙ্গ সৃষ্টি ক'রে পরস্পর কাটা-কাটি ক'রতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। বিশ্বপ্রেমের সমৃদ্ধ কবিদের হর্ম্ম্য প্রাচীরের অভ্যন্তরে যখন গান-বাজনা পান-ভোজন এবং সব রকমের ভোগের চূড়ান্ত অভিনয় চ'লছে, তখনি হয়ত নীচে পার্শ্বস্থ খোলার ঘরে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত গরীবের ছেলেটি একটু পথ্যের অভাবে প্রাণত্যাগ ক'রছে। গরীবের দুঃখের খবর, অভাবের কথা, তার ধনী প্রতিবেশীর কাণে পৌঁছবার পর্য্যন্ত কোন উপায় নেই! ধনি-দরিদ্রে চেনাশুনার কথা ছেড়ে দে, এই ক'লকাতা সহরে আজকাল দুইজন বিশ্বপ্রেমিক একই গলিতে পাশা-পাশি বাড়ীতে বাস ক'রেও পরস্পরের সঙ্গে আলাপ কর-বার জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত হয় না। আমাদের সেকালে অর্থাৎ পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে, এই ক'লকাতা সহরেই

আমরা এক পাড়ার লোকে প্রত্যেকের সুখদুঃখের সকল খবরই রাখতাম। তখন বিশ্বপ্রেমের কথা শোনা যেতো না বটে, কিন্তু বাড়ীতে তত্ত্বতলাস এলে তা আশে-পাশের লোককে দিয়ে খাওয়াই রীতি ছিল। ধনিদরিদ্রের মধ্যে এখন যে দূরত্ব দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, সেটাও তখন এতটা প্রকট হ'য়ে ফুটে ওঠেনি। আমরা ত বড়লোক ছিলাম না, কিন্তু আমাদের পাড়ার ধনী ৺বিশ্বনাথ লাহার বাড়ী থেকে আমাদের বাড়ীতে প্রায়ই মিষ্টান্ন আস্‌তো। তখনকার লোকের মধ্যে কেমন যেন একটা প্রাণ ছিল, সহৃদয়তা ছিল, একটা মাখামাখি ছিল, সরস সমবেদনার টান ছিল; তোদের নবীন সত্যযুগের নবোদিত সূর্য্যের কিরণে সে রসটুকু যেন শুকিয়ে গিয়েছে।"

আমি ব'ললাম, "তা হবে না কেন, দাদাম'শায়, তখন ত আর জীবিকাসমস্যাটা এতটা কঠিন হ'য়ে ওঠেনি।"

দাদাম'শায় ব'ললেন, "কঠিন ত হয়েছেই। তা' ছাড়াও, অন্যান্য কারণেও, দেশের লোকের মেজাজটা নজরটা বড়ই ছোট হ'য়ে প'ড়েছে। তখনকার তুলনায় দুর্ম্মূল্যতা যেমন বেড়েছে, আয়ও তেমনি বেড়েছে। তবে

এখন নূতন দু'টো জিনিসের বাড়াবাড়ি দেখ্‌ছি যা' তখন কমই ছিল। একটা রোগ আর একটা বিলাসিতা। আমার মনে হয়, শুধু অন্নসংকট প্রবল হ'য়েছে ব'লে নয়, ঐ বিলাসিতাটা অতিরিক্ত রকম বেড়ে গিয়ে আমাদের স্বার্থপরতার মাত্রাটাও চরমে উঠেছে। কোন মতে কেরাণীগিরি ক'রে যারা অন্নসংস্থান করে, মাসের ১৫ তারিখে যাদের হাত খালি হ'য়ে যায়, মুদীভায়া ধার দেওয়া বন্ধ ক'রলে যাদের অন্ধকার দেখতে হয়, তারাও গ্রীষ্মে আদ্দির জামায় সোণার বোতাম এঁটে, আর শীতে শাল গায়ে দিয়ে নিমন্ত্রণ খেতে যায়। সাত টাকার ধোসায় যাদের চালান উচিত, তারাও কাবুলীর কাছে ধারে পঞ্চাশ টাকার আলোয়ান কেনে। মেয়ে মহলে বিলাসিতার মাত্রাটা আরও বেশী। এই সব বাজে বাবুগিরি উঠিয়ে দিলে, আমার মনে হয়, এ কালের লোকের বিশ্বপ্রেমটা জীবনে চর্চ্চা করবার একটু সুবিধা হ'লেও হ'তে পারে। গরীবের কথা থাক। যাদের অবস্থা সচ্ছল, তারাও দূরাগত বন্ধুকুটুম্বকে দু'বেলার বেশী তিন বেলা ভাত দিতে হ'লেই বিরক্ত হয়।

"পথের ভিক্ষুককে একটা পয়সা বা বন্যার চাঁদায় একটা টাকা দিয়েই সুলভে আজ কাল বিশ্বপ্রেমের পরিচয় দেওয়া যায়। একজন এই শ্রেণীর বিশ্বপ্রেমিক, তোদের নবযুগের একজন পাণ্ডা এই পাড়ায় থাকেন। তাঁদের বাড়ীতে সেদিন রাত্রি সাড়ে নটার সময় জামাই এল, তখন তাদের হাঁড়ী উঠে গেছে। সুতরাং তার আহারের জন্য বাজারের লুচি আলুর-দম প্রভৃতির ব্যবস্থা হোলো। জামাইয়ের সকালেও ভাত জোটেনি, তার ওপর রাত্রেও এই অখাদ্যের ব্যবস্থা। তোর মামার সে বন্ধু, তাই তার কাছে দুঃখ ক'রছিল, আর ক'লকাতার লোকের নিন্দে ক'রছিল। সেকালে কিন্তু এই ক'লকাতাতেই, রাত দুপুরেও বাড়ীতে অতিথি এলে, বাড়ীর মেয়েরা দু'একখানা ব্যঞ্জন সমেত ভাত রেঁধে খাওয়াতো। না হবে কেন? তখনকার মেয়েদের সেবাবুদ্ধি বা ধর্ম্মজ্ঞানটা খুবই বেশী ছিল; আর নবেল প'ড়ে এবং কার্পেট বুনে এখনকার মেয়েদের যেমন ঘুণধরা শরীর, তখন তেমনটি ছিল না। তাই ব'লছিলাম, সেকালে ক'লকাতার লোকেদের মধ্যেও দয়াধর্ম্মের চর্চ্চাটা ভালই ছিল। সাধারণ গৃহস্থও বাড়ীতে অতিথি-কুটুম্ব

এলে নিজেকে ভাগ্যবানই মনে ক'রতো। আর যাদের দু'পয়সা ছিল তাদের বাড়ীতে অতিথি অভ্যাগতের ভিড় লেগেই থাক্‌ত। আমার বেশ মনে আছে সুখচরনিবাসি সদরালা (সবজজ) ৺তারকনাথ সেনের কলিকাতার বাসায়, সুখচর থেকে যত লোক ক'লকাতায় আস্‌তো, সবাই আশ্রয় এবং অন্ন পেতো।"

এই অবধি ব'লে দাদাম'শায় একটু গম্ভীর হ'লেন। একটু থেমেই আবার বল্‌লেন, "ত্যাথ্‌ ভাই, তেমনটি আর হবে না। তোদের একালে যেন রসকস কিছুই নেই। অথবা, পুরাণো কথার ভেতরেই বুঝি কেমন একটা মাদকতা আছে। বর্ত্তমান অবস্থা ও ঘটনাবলীতে আমরা এমনি অভ্যস্ত, যে এতে একটা জমকালো রকম বিশিষ্টতা না থাকলে এটা আমাদের মনোরঞ্জন ক'রতে পারে না; কিন্তু পুরাতনের খুটিনাটি পর্য্যন্ত মধুমাখা। নিজের ছোট্ট একটি পুরাণো ঘটনার স্মরণে যে আনন্দ হয়, নূতনের ভিতর বিপুল আয়োজন ক'রেও সে আনন্দ পাওয়া যায় না। পুরানো সুখের কথা, দুঃখের কথা, মিলনের কথা, বিচ্ছেদের কথা, জয়ের কথা পরাজয়ের কথা সবই

যেন মধুমাখা। পুরাণো বন্ধু, অতীতের বাসস্থান পুরাণো বাড়ী, পুরাণো পথ, গাছ, ঘাট সবই যেন আজ মনে প'ড়ে যাচ্ছে। এই জরাজীর্ণ দেহভারের বিড়ম্বনার মধ্যে যা' কিছু সুন্দর তা'তো ঐ পুরাতনের মধ্যেই সংরক্ষিত। আর ভাই, পুরাণো প্রিয়জন সব একে একে স'রে প'ড়েছে। বিগত জীবনের সে অদম্য উদ্যম, আনন্দের কোলাহল সবই তো নিবে গেছে।"

ব'লতে ব'লতে দাদাম'শায়ের চোখ দুটো জলে ভিজে এলো। "আর এক ছিলিম তামাক সাজি" ব'লে আমি তামাক সাজতে ব'সলাম। দাদাম'শায় চুপ ক'রে র'ইলেন। আমি কথাটাকে আর একদিকে ফিরিয়ে দেবার জন্যে ব'ললাম,—

"আচ্ছা দাদাম'শায়, তখন এই ক'লকাতা সহরটা নাকি বেজায় নোংরা ছিল ?"

দাদাম'শায় ব'ললেন, "তা' একটু নোংরা থাকলে কি হবে। তখনকার ক'ল্‌কাতাই আমার লাগতো ভাল। আজকাল সহরের ধুলো আর ধোঁয়ায় যেন দম আট্‌কে আসে। শীতকালে রাস্তায় বের হ'লে মনে হয় যেন একটা

প্রকাণ্ড উনুনের মধ্যে বাস ক'রছি। তা একটু নোংরা হ'লে কি হবে, ক'লকাতায় তখন এর চেয়ে ঢের আরাম ছিল, আর কোলাহল ছিলনা ব'লে বেশ শান্তি ছিল। সে আজ প্রায় ষাট বৎসরের কথা—বর্ত্তমান সহরের ভাব কিছুই ছিল না। বৌবাজার থেকে দক্ষিণ দিকটা বেশ জেঁকে উঠেছে বটে, কিন্তু উত্তরাঞ্চলে তখনও পাড়াগাঁয়ের ভাবটা একেবারে লোপ পায়নি। সুকিয়াষ্ট্রীটের মোড় থেকে শ্যামবাজার পর্য্যন্ত বেশ গ্রাম্যভাবাপন্ন। একতালা ছোট ছোট পাকা বাড়ী অনেক ছিল বটে, কিন্তু বড় বড় অট্টালিকা আদৌ ছিলনা ব'ল্লেই চলে। বড় বড় ইমারতের মধ্যে শোভাবাজারের রাজাদের বাড়ী, পাথুরেঘাটার কয়খানা বাড়ী, রাজা রাজেন্দ্রমল্লিকের বাড়ী, গোরাচাঁদ দত্তের বাড়ী (যা এখন লাহাদের হাতে এসেছে), মতিশীলের বাড়ী শ্যামমল্লিকের আর তাঁর জ্ঞাতিদের কয়খানা বাড়ী—এই বোধ হয় তখনকার বাঙ্গালী পাড়ার বড় বাড়ীর পুরো তালিকা। ছোট ছোট বুরুড়ীগুলো সব ইট-বা'র-করা; জানালার কাঠের গরাদেগুলো আলকাৎরা-মাখানো।

"তখন ফুটপাথ ছিল না। রাস্তার ধার খানিকটা দূর্ব্বাঘাসে আচ্ছাদিত—তার ওপর মান আর কচুর গাছ। পথের দু'ধারেই নর্দ্দামা (surface drains) ছিল, তা'তে কালো ময়লা জল চ'লত। কোন কোন জায়গায় যেমন ঠনঠনের কালীতলায়, আহিরীটোলায়—এই নর্দ্দামাগুলো এত চওড়া আর গভীর ছিল, যে ইচ্ছা ক'রলেই তাতে ছোট ডিঙ্গি চালাতে পারা যেত। বর্ষাকালে ঐ সকল নর্দ্দামায় রীতিমত স্রোত চ'লত, সময়ে সময়ে নর্দ্দামা থেকে দূষিত বাষ্প উঠতে দেখা যেত, যেন জল ফুটে ওপরে বড় বড় বুদ্বুদ উঠতে থাকতো"।

"বড় বড় হাঁড়ী ক'রে ময়লা ফেলবার বাবস্থা ছিল। জ্যাক্‌সন ঘাটে (বর্ত্তমান হাওড়ার পুলের নিকটে) ময়লা ফেলা হ'ত। জলে প্রচুর ময়লা ভাস্‌তে দেখা যেত। ভাসন্ত বিষ্ঠার উপদ্রবে গঙ্গাস্নান করা একটা বিড়ম্বনাই ছিল—বিশেষ জোয়ারের সময়। এই ব্যাপারকে লক্ষ্য ক'রেই হিন্দুস্থানীরা ব'লত, "যো যায় কলকাত্তা, গু খায় আলবত্তা।

"তখন জলের কল হয়নি। জলের কল আর under-

ground drain (ভূগর্ভসঞ্চারী পয়ঃপ্রণালী) হ'ল ১৮৬৯ সালে। সহরের সর্ব্বত্র দীঘি আর ছোট বড় পুষ্করিণী ছিল। অনেক ভাল ভাল পুকুর বুজিয়ে দিয়ে সহরের শোভা আর স্বাস্থ্য দুইয়েরই হানি হয়েছে ব'লেই মনে হয়। অধিকাংশ পুকুরেরই অবস্থা কিন্তু ভাল ছিল না। পুকুরের পাড়ে চতুর্দ্দিকে সব গয়লাদের বাস ছিল। গোবর-চোণার জল এসে ক্রমাগত পুকুরে পড়ায় কোন কোন পুকুরের জল অত্যন্ত দূষিত ছিল। পানীয় জলের জন্য চারিটী দীঘি প্রশস্ত ছিল, হেদো, গোলদীঘি, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের দীঘি আর লালদীঘি ; তার মধ্যে লালদীঘির জলই ছিল সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উড়িয়া ভারীরা ভারে ভারে জল বহন ক'রে ক'লকাতাবাসীর তৃষ্ণা নিবারণ ক'রতো। গঙ্গাজলও অনেকে পানীয়রূপে ব্যবহার ক'রতো। মাঘ মাসের গঙ্গাজল জালা জালা তুলে রাখা হোতো। কারণ মাঘ মাসের জলে নোনা কম থাকতো। আগে আমাদের গায়ে সব নোনা ফুটতো। কলের জলের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় ঐ নোনা-লাগা উঠে গেল। দুপুরবেলা ঘুমিয়ে উঠলে গায়ে নুনের গুঁড়ো চিকচিক ক'রতে দেখা যেতো।

ছোট ছোট ছেলেদের গায়ে ঐ নোনা-লাগাটা বেশী লক্ষিত হ'ত। একতালা বাড়ীতে নোনার আক্রমণটা বেশী হত। গঙ্গার এপারে যত নোনালাগা ছিল ওপারে তত ছিল না। ওপারের গঙ্গাজল, জানি না কি কারণে, খুব কম লবণাক্ত বলেই মনে হ'ত। যেন মনে হ'চ্ছে নহর দিয়ে গঙ্গাজল এসে গোলদীঘিতে প'ড়ত। নহরটা মানে—পথের ধারে জমি থেকে দেড়হাত দুহাত উঁচু ক'রে গাঁথা জলপ্রণালী ছিল। ঐ জলপ্রণালী বা নহরে গঙ্গাজল চ'লত। সে জলও ভারীরা আর ভিস্তিরা গৃহস্থকে বিক্রী ক'রে বেড়াত। প্রায় প্রত্যেক বাড়ীতেই একটা ক'রে কুয়া ছিল। কুয়ার জল এমনি কটু যে মুখে ক'রবার যো ছিল না। প্রাতঃকালে "কুয়ার ঘটী তোলা" হেঁকে যেত, ঘটী বা কোন দ্রব্য কুয়ায় প'ড়লে তারা তুলে দিত।

তখন দক্ষিণদিকটা অর্থাৎ বৌবাজার থেকে গড়ের মাঠ পর্যান্ত গ্যাসের আলোর ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু আমাদের পাড়ায় অর্থাৎ উত্তরাংশে কাঠের lamp postএ (খুঁটিতে) ভ্যারেণ্ডার তেলের আলো জ্ব'লতো। আলোগুলো বেজায় মিট্‌মিট্ ক'রে জ্ব'লতো, তাও দূরে দূরে। রাত্রি নয়টার

পর পথে কদাচিৎ লোক চ'লতো। পাহারাওলাদের মাথায় শাম্‌লার মত এক রকম লাল পাগড়ী ও অঙ্গে চাপকান শোভা পেত—কোমরবন্ধ থেকে একগাছা রুল ঝুলত।

ছ্যাকরা গাড়ী কিছু কিছু ছিল কিন্তু তা' অপেক্ষা পাল্কীর চলন ছিল ঢের বেশী। সাহেব-মেমেরাও কখনও কখনও পাল্কী ব্যবহার ক'রতো। উড়িয়ারা পথের মোড়ে তালপাতার বা গোলপাতার বড় বড় ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো। দূরত্বহিসাবে, একটা, দু'টো, চারটে পয়সা দিলে তারা মাথায় ছাতা ধ'রে সঙ্গে সঙ্গে যেত। কিন্তু ওরকম ছাতাওয়ালার সংখ্যা তখন থেকেই কমে আস্‌ছিল। ক্রমে লোহার বাঁটের বিলাতীছাতার আমদানী হওয়ায় উড়িয়া ছাতাওয়ালাদের অন্ন উঠে গেল। জলের কল যখন হ'ল, তখনও হাজার হাজার উড়িয়া ভারীর দিন-গুজরানের উপায় বন্ধ হ'লো। যখন জলের কল হ'ল, তখন উড়িয়ারা দলে দলে লাটসাহেবের বাড়ীর সম্মুখে গিয়ে চীৎকার ক'রেছিল—"কলের জলে আমাদের জাত গেল, সর্ব্বনাশ হোলো।" অনেক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাও নাকি তাদের সঙ্গে চীৎকারে যোগ দিয়েছিল।

"আমরা যে বাড়ীতে ছিলাম, তার ভাড়া দিতাম দশ টাকা,—দোতালা বাড়ী, নয় দশখানা ঘর।" পঠদ্দশায় কিছুদিন একটা বাড়ীতে মেস ক'রেছিলাম, তাতে ঘর ছিল বারো তেরো খানা, ভাড়া দিতাম ষোল টাকা। আমাদের বিশ্বাত্মবোধ মোটেই ছিল না, কিন্তু মেসে আমরা যে কয়জন থাকতাম, সবাই সমান ভাড়া দিতাম। এখনকার স্বদেশ-প্রেমিক নব্যেরা যেমন দরজা জানালা মেপে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুবিধা অসুবিধা অঙ্ক ক'সে নানারকম ঘরের আর সিটের নানারকম ভাড়া ধার্য্য করে, তখনকার দিনে তেমনটি ছিল না। নিজের সত্ত্ব, নিজের অধিকার কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেওয়া আর বিশ্বপ্রেমের জাবর কাটা, এই হ'লো একালের সভ্যতার ঝোঁক; তাই একালের বিশ্বপ্রেমিকদের পেঁচা-মুখে সেকালের কলহাস্যের উচ্চরোল ওঠে না, তাদের কথায় আচরণে সে প্রাণখোলা মেশামিশি ভাব আর নেই।"

"আচ্ছা, 'দাদাম'শায় কি করলে আবার আমরা সেকালের মানুষের মত হ'তে পারি ?"

দাদাম'শায় ব'ললেন, "দূর ক্ষ্যাপা, সেকালের মানুষের

মত হ'তে যাবি: কেন? গত একশ' বছরে দেশের ওপর দিয়ে একটা যুগান্তর ব'য়ে গেল, তার ফলভাগী হ'য়ে তোদের গ'ড়ে তুলতে হবে একটা নূতন তন্ত্র। সেই নূতন তন্ত্রের যদি বিশ্বাত্মবোধ নাম দিস্, তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু অন্তরের আদর্শ এই বিশ্বপ্রেমটা যদি হাতের গোড়ায় আশে পাশে মূর্ত্ত হ'য়ে ফুটে না ওঠে, তা হলে তোদের কাছ থেকে আশা করবার বেশী কিছু নেই।

"দ্যাখ, সংসারে চার রকমের লোক আছে। প্রথম, যারা অতীতের গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকতে ভালবাসে। পুরাণো বিধিনিষেধ, তিথিনক্ষত্র সব বাঁচিয়ে এরা খুব পা টিপে টিপে পুরাতনের গণ্ডীর ভেতরে ঘুরপাক খায়; এগিয়ে যাবার চেষ্টাটা এদের মতে দারুণ ধৃষ্টতা। যা হ'য়ে গেছে তেমনটি আর হবে না। এই সিদ্ধান্ত ক'রে এরা হিমালয়ের ঋষিসঙ্ঘের দিকে মুখ ক'রে চক্ষু মুদে বিজ্ঞের মত পুরাতনের রোমন্থন করতে ক'রতেই জীবনটা কাটিয়ে দেয়। দ্বিতীয়, যারা অতীতের প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ। এরা পুরাতনকে একেবারে ভূমিসাৎ ক'রে, একটা নূতন কিছু করবার জন্যে, গড়বার জন্যে, ভারি ব্যস্ত। একটা

বিপ্লবের সৃষ্টি ক'রে এরা রাতারাতি বড়মানুষ হ'তে চায়। একটা নূতন শাসনপদ্ধতি, ধর্ম্মরাজ্যের একটা নূতন আবিষ্কার, সমাজের একটা নূতন ভিত্তি, যাই পাওয়া আর অমনি বেগে আঁকড়ে ধরা। উঃ, এতটা কাল কি অন্ধকারেই ছিলাম,—বুদ্ধ শঙ্কর নানক চৈতন্য দেশের কি সর্ব্বনাশটাই ক'রেছে। দাও এক বোমার ঘায়ে সব কটাকে নস্যাৎ ক'রে—এই রকম একটা ভাব নিয়ে এরা নবসৃষ্টি ক'রতে গিয়ে ক'রে বসে একটা অনাসৃষ্টি। তৃতীয়, যারা বর্ত্তমানে দিনগত পাপক্ষয় করে। এরা অতীত বা ভবিষ্যৎ কিছুরই ধার ধারে না। এদেরই নাম প্রাকৃত মানুষ। পুরাতনকে দেখলে এরা বলে, তোমাদের ও চালকলার নৈবেদ্যে আর চ'লবে না, নূতন কিছু থাকে ত বা'র কর; আর নূতনকে দেখলে বলে, যে দেশে ব্যাস বশিষ্ঠ জনক যাজ্ঞবল্ক্য জন্মে গেছে, সেখানে তুমি আবার কে নূতন কথা ব'লতে এলে? এরা সকলেরই প্রতি বক্র দৃষ্টি করে, সকলকেই তাড়া করে। সাপের মধ্যে যেমন ঢোড়া, মানুষের মধ্যে তেমনই প্রাকৃত মানুষ; এদের hissingএর শব্দে সারা দেশটা সন্ত্রস্ত। ভাগ্যে এদের কোন বিষ নেই,

নইলে এরা যে রকম দলে পুরু, এদের প্রতাপে সৃষ্টিটা রসাতলে যাবার কথা। চতুর্থ, যারা পুরাতনকে শ্রদ্ধা করে ভক্তি করে, আর সেই শ্রদ্ধা ভক্তির ভিত্তির ওপরেই নূতনকে গ'ড়ে তোলে। এরা অতীতের ধারা, অতীতের অর্থকে বুঝে নিয়েই ভবিষ্যৎকে গ'ড়তে চায়। অতীত আর ভবিষ্যৎ একই গল্পের দুটি অধ্যায়, একই সূত্রের দুই প্রান্ত, এই কথা সর্ব্বক্ষণ স্মরণ রেখে এরা ধীরে ধীরে নূতন একটা ভবিষ্যৎকে নির্ম্মাণ করে। এরা যা গড়তে চায়, সেটাকে নূতন আদর্শের আবিষ্কার ব'লে স্পর্দ্ধা করে না। সৃষ্টি-বিকাশের অন্তর দেবতা চিরনূতন বেশে নিত্য লীলাশীল, এই কথা বুঝে এরা তার নূতন বিগ্রহকে বরণ করে ঘরে তুলে নেয়। আবার ঐ নূতন বিগ্রহের মধ্যে পুরাণো বিগ্রহেরই রূপান্তর দেখতে পেয়ে মুগ্ধ হয়। তাই পুরাতনের রূপকে এরা রূপান্তরিত ক'রতে চাইলেও, পুরাতনের আদর্শের সঙ্গে এদের বিবাদ থাকে না। এরাই দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন নবযুগের মানুষ। বেদবেদান্তে ভাগবতপুরাণে যে আত্মজ্ঞান প্রচারিত হ'য়েছিল ভারতের সেই সনাতন আত্ম-জ্ঞানকে নিজ আদর্শ ব'লে স্বীকার ক'রেই এরা গৌরব

বোধ করে। মানুষ যে ভগবান, এই কথা বলবার জন্যে একটা নূতন সত্য আবিষ্কারের কণ্ডুতি এদের উপস্থিত হয় না। ত্যাগ ভোগ সবই যে আত্মময় এ কথাটাকে সাব্যস্ত ক'রতে গেলে পুরাতনকে ঘাড় ম'টকে মেরে ফেলবার কোনই আবশ্যক নেই। আত্মাই সব, আত্মজ্ঞানই লক্ষ্য, প্রাপ্তব্য; আত্মজ্ঞান মানেই বিশ্বাত্মবোধ, বিশ্বপ্রেম ;—প্রাচীনের সকল কথার মধ্যেই উদাত্তস্বরে এই একই সত্যকে ঘোষণা করা হ'য়েছে। ঋগ্বেদের "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি", ছান্দোগ্যের "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "আত্মৈবেদং সর্ব্বং", "ঐতদাত্মমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো", "যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ং"—ইত্যাদি বাক্য আজকাল স্কুল কলেজের ছেলেদের মুখেও ভূরিভূরি শুনতে পাই। শুধু প'ড়লে হ'বে না, নবযুগের মানুষকে এই সকল কথার মর্ম্ম গ্রহণ ক'রতে হবে। শঙ্করের মায়াবাদ বা ত্যাগবাদ, শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মসন্ন্যাস, বুদ্ধের অহিংসা, চৈতন্যের প্রেম, এগুলো সব একটা জিনিসেরই রকমফের, তাই বুঝে নবযুগের মানুষ এদের সকলেরই প্রতি শ্রদ্ধাবান হবে।

আর সেই প্রাচীন আত্মজ্ঞানকে ফুটিয়ে তুলতে হবে বর্ত্তমান মানুষের বিচিত্র কর্ম্মস্রোতের গোলকধাঁধার ভেতরে। এইখানেই নূতনত্ব। রাষ্ট্র বাণিজ্য সমাজ ও শিক্ষার মধ্যে যে অপূর্ব্ব জটিল অতিকায় রূপসকল বর্ত্তমান মানুষের চারিদিকে ফুটে উঠেছে সে সবগুলোকে ধীরে ধীরে এমনি কৌশলে রূপান্তরিত ক'রে নিতে হবে, যাতে প্রত্যেক মানুষেই আত্মজ্ঞানের বিশ্বপ্রেমের দিকে কিছু না কিছু এগিয়ে যেতে পারে। প্রাকৃত মানুষ, নূতনের পাণ্ডারা, আর পুরাতনের প্রতি গোঁড়া মানুষ, এরা সকলেই এই নূতন সৃষ্টির পথে পদে পদে বাধা দিবে, আর ঐ বাধাই আবার এদের শক্তিকে বাড়িয়ে দিয়ে, তার গতিকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে তাকে গন্তব্যে পৌঁছিয়ে দেবে।"

আমি বললাম, "সমগ্র মানবের জটিল জীবনস্রোতের এই অনন্ত ধারার প্রত্যেকটীর গতি পরিবর্ত্তন ক'রে, তাকে আত্মমুখী ক'রে তোলা—এ তো কল্পনা করতেও মাথা ঘুরে যাচ্ছে।"

দাদাম'শায়—"হাঁ, তা' যেতে পারে। মানুষকে আত্মস্থ করা, তাকে তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা—এতো আঁর

ছেলের হাতের মোয়া নয় যে, কেড়ে নিবি আর মুখের মধ্যে ফেল্‌বি। তবে একটা কথা কি জানিস, যার সৃষ্টি, তার মাথার ব্যথাটা আমাদের চেয়ে নিশ্চয় বেশী। তোর আমার যে শিরঃপীড়া, এটা তার শিরঃপীড়ারই ছিটে ফোঁটা বই ত নয়। যার কাজ, সেই যখন এতটা কাল ক'রে আসছে, তখন আজ হঠাৎ যে তোর আর আমার ঘাড়ে এই encumbered estateটা (দায়গ্রস্ত সম্পত্তি) চাপিয়ে সে retire (অবসর গ্রহণ) ক'রবে, তা ত বোধ হচ্ছে না। তবে, মানুষ হিসাবে যখন কর্ত্তব্য বুদ্ধিটা র'য়েছে, তখন পুরুষকারও নিশ্চয় দরকার।"

আমি—"আমিও ত দাদাম'শাই, সেই কথাই জিজ্ঞাসা ক'রছি? কেবল ওঠ, জাগ, হে অমৃতের পুত্র, দেখ নবযুগের অরুণোদয়; এ ভবটা মোটেই নয় কো রোগ অতএব চুটিয়ে কর ভোগ; নারীকে দাও স্বাতন্ত্র্য, আর গড় দেবজাতি শুন অন্তর দেবতার প্রেরণা; উঠ তুরীয়ে; আর নেবে এস তৎক্ষণাৎ,—এই রকম ভাবের ফোয়ারা ছুটীয়ে দেওয়া ছাড়া কিছু কর্ত্তব্য আছে কি?"

দাদাম'শায়—"না, মানুষকে কেবল কতকগুলো ভাবের ফাঁকা আওয়াজে মাতিয়ে তুললে শেষ অবধি ক্ষতি বই লাভ হয় না। প্রথমে গুরু কৃপায় বলীয়ান হ'য়ে ধীর হ'য়ে সাধনা করতে হয়। যিনি আত্মজ্ঞ, তাঁরই কাছে আত্ম-জ্ঞানের দীক্ষা নেওয়া চাই। গুরুদত্ত সাধনায় মানুষ যতই অগ্রসর হয়, ততই তাঁর দৃষ্টি খুলে যেতে থাকে, প্রেমে হৃদয় ভ'রে উঠতে থাকে; তখন সে আবার চুম্বকের মত অন্য মানুষকে আকর্ষণ করতে থাকে। শুধু কথায় প্রেম বিলিয়ে বেড়াবার লোভটি সম্বরণ ক'রতে হবে। শ্রীগুরুরূপী ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে অহ-ঙ্কারকে পিষে ধূলো ক'রে ফেলতে হবে। কে প্রকৃত সদ্‌গুরু, কে নয়, এ বিচারও আসবেই, কিন্তু এটা অতি সত্য কথা যে, শান্তির জন্যে মনে প্রকৃত ব্যাকুলতা এলে, তার সদ্‌গুরু লাভ হবেই। যে যে-স্তরের মানুষ, সেই হিসাবেই তার প্রেমের তারতম্য আর এই প্রেমের তারতম্য অনুসারেই গুরুলাভ। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, যার কাছে যার তৃপ্তিবোধ তাঁকেই গুরু ব'লে বরণ ক'রে নিতে হবে। শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে ব'সে

সাধনসহায়ে তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা যত বাড়তে থাক্‌বে, মানুষের সমাজ বাণিজ্য এবং রাষ্ট্রের অনুষ্ঠানগুলো আপনা-আপনি ততই বিশুদ্ধ হ'য়ে উঠতে থাক্‌বে। নচেৎ শুধুই 'অন্তর দেবতার প্রেরণার' বা 'মন-গুরুর' চেলার দল শত ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ ক'রেও অহঙ্কারের বশে শিব গ'ড়তে গিয়ে কেবল বানরই গ'ড়ে বসবে।"

তখন অনেক বেলা হ'য়ে গিয়েছিল। ক্ষুধানল আমার জঠরদেশকে মথিত ক'রে চর্ব্ব্যচোষ্যাদি চতুর্বিধ রসসম্ভোগের যে ব্রহ্মানন্দ, মস্তিষ্কের সেই ব্রহ্মানন্দরূপী স্নায়ুকেন্দ্রটাকে মুহুর্মুহুঃ কম্পিত ক'রছিল; কিন্তু সেখানে বিশেষ সাড়া না পেয়ে মস্তিষ্কের দেড়হাত উপরের বিজ্ঞানভূমি বা তুরীয় প্রদেশ থেকে দিব্যপ্রেরণার সঙ্গে নেবে এসে আমার পা দুটোকে মামার বাড়ীর রান্নাঘরের দিকে প্রায় গতিশীল ক'রেছে, এমন সময়ে দাদম'শাই বললেন, "বিশু, ভাই আর এক ছিলিম গুড়ুক খাওয়া।"

আমি ফলকে নিয়ে তামাক সাজতে ব'সে ভাবলাম যে বুড়োকে চটিয়ে না দিলে থামানো কঠিন। তাই ব'ললাম, "দাদাম'শায়, আপনি যাই বলুন, 'মানুষ সাক্ষাৎ নারায়ণ,

এ যুগে আবার 'আরো নারায়ণ'। * গুরু হে প্রভু হে, ব'লে সে যদি কোন মানুষের কাছে মাথা হেঁট করে, তাহ'লে তার জাত যাবার কথা। দেখুন, ইংরাজ প্রভুর কাছে ত বাহিরের দিক্‌টার দাসখত লিখে দিয়েছি, আপনি কি বলতে চান, যে মনের স্বাধীন রাজ্যেও আবার গোলাম-খানা ব'সাব? এই ইংরাজ শাসিত দেশে আবার গুরুগিরি শাসনটা চালিয়ে দিলে, অন্তরে বাহিরে দুই দিকেই গোলামী ঢুকে যাবে। বরং ফরাসি মুলুকে বাহিরের চাপটা কম; সেখানে গুরুর নাম-টাম বদলে, তাকে সাধনের সহায়-টহায় যাহোক একটা ব'লে, কোন মতে হজম করা চলে।"

দাদাম'শায় শুক্‌নো গালে একগাল হাসি হেসে বল্লেন, "ভায়ার আমার স্বাধীনতাজ্ঞানটা দেখছি বেজায় টনটনে।

---

* বর্দ্ধমানের এক হোটেলে একদিন খেতে যাই। আচমন ক'রতে গিয়ে দেখি জলের 'চতুর্বংসের' মধ্যে গোটাকতক ভাত পড়ে র'য়েছে। চাকরটাকে ডেকে বললাম, "ওরে জলটা যে এঁটো হয়ে গিয়েছে।" চাকরটা অম্লানবদনে বল্লে "জল কি এঁটো হয় কর্ত্তা, জল যে "নারায়ণ।" চৌদ্দ পনের বছরের একটা বালক-চাকরও সেখানে ছিল, সে বললে "হোটেলে আরও নারায়ণ।"

নে ক'লকেটা শীগ্‌গির ধরা। তোর কি খিদে পায় নি ?"

ভায়া, দাদাম'শায়ের কথাবার্ত্তায় তোমাদের ওপরও একটু কটাক্ষ আছে, যেন রাগ কোরো না। ইতি

৪

দাদা, সেদিন বিকেল বেলা সাত-পাঁচ নানারকম চিন্তায় প্রাণটা যেন কেমন এক রকম হ'য়ে গেল। পথে বেরিয়ে প'ড়লাম। কিন্তু ভিড় আর ধুলো ঠেলে চ'লতে চ'লতে প্রাণটা যেন আরও হাঁপিয়ে উঠ্‌লো। কোন্ উপায়ে এই রকম বড় বড় রাক্ষসী নগরীর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন হবে এই কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তে, আর মোটর গাড়ীগুলোর বাপান্ত ক'রতে ক'রতে একটা পার্কের মধ্যে ঢুকে প'ড়লাম। একটু ছায়া দেখে একটা জায়গা বেছে নিয়ে সটান চিৎ হ'য়ে শুয়ে পড়া গেল। অজগর শহর আর মোটর-গাড়ীগুলোর চিন্তা ছেড়ে দিয়ে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে বেশ একটু আরাম বোধ হ'ল। কিন্তু এই আয়েসটুকু বেশীক্ষণ ভোগ করবার সম্ভাবনা ক্রমেই ক'মে আস্‌তে লাগলো; কারণ, দেখতে দেখতে পার্কের মধ্যে জনতা বেড়ে উঠ্‌লো। অকস্মাৎ শতকণ্ঠে "মহাত্মা-গান্ধীকি-জয়"-ধ্বনিতে আমার খেয়াল-

বেশ ভিড় জ'মে উঠেছে। ভিড়ের মাঝে মাঝে নিশানধারী যুবকের দল বেগে আনাগোনা কর'ছেন।

একজন নিশানধারী যুবক আমার দিকে অগ্রসর হ'য়ে ব'ললেন, "উঠুন ম'শায়, এখানে মিটিং হবে।"

আমি একটু ন্যাকা সেজে জিজ্ঞাসা ক'রলাম, "কিসের মিটিং ?"

যুবক হো হো ক'রে হেসে উঠলেন, ব'ললেন, "কিসের মিটিং তাই জানেন না? আপনি সদ্য কোন পাড়াগাঁ থেকে আস্‌ছেন বুঝি?—নন্‌-কো-অপারেশন, বুঝ্‌লেন?"

আমি পূর্ব্ববৎ ধরাশায়ী অবস্থাতেই গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা ক'রলাম "মিটিংয়ের উদ্দেশ্য ?"

যুবক উত্তর দিলেন, "স্বরাজ!" 'র'য়ের আকারটা যে রকম লম্বা ক'রে উচ্চারণ ক'রলেন, তাতে স্পষ্ট বোঝা গেল যে তাঁর প্রাণটা তখন খুবই দরাজ ছিল।

আমি পুনশ্চ প্রশ্ন ক'রলাম, "তার উপায় ?"

যুবক বিরক্ত হ'য়ে ব'ললেন "কি আশ্চর্য্য! আপনি দেখছি অদ্ভুত মানুষ! উপায় হ'চ্ছে সহযোগিতা-বর্জ্জন, অর্থাৎ কিনা, ইংরেজের সঙ্গে, ইংরাজের সকল কাজের

সঙ্গে, সকল সম্পর্ক ত্যাগ ক'রলেই, বিনা লড়াইয়ে আমাদের রাজত্ব আমাদের হাতে ফিরে আসতে বাধ্য। উপায় একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র—"

আর একজন যুবক এগিয়ে এসে ব'ললেন, "কি হে কাপ্তেন, তুমি যে পল্লীগ্রাম organise ক'রতে বেরুবার আগেই দেখছি বক্তৃতা সুরু ক'রে দিয়েছ।

প্রথম যুবক। কি করি বল, পল্লীগ্রাম স্বয়ং আমার কাছে এসে উপস্থিত হ'য়েছেন। এ ভদ্রলোক স্বরাজ, নন-কো-অপারেশন—এ সব কোন খবরই রাখেন না। কি আশ্চর্য্য, এমন দিনে এমন মানুষও আছে। Just fancy, how stupendous the task before us! (আমার দিকে ফিরে ব'ললেন) উঠুন ম'শায়, আপনার সঙ্গে বকা বৃথা। মিটিংয়ের সময় হ'য়ে এল, এইখানে প্রেসিডেণ্টের টেবিল পাত্তে হবে; শীগ্‌গির উঠে পড়ুন।

আমি। আমি ত উঠ্‌তে প্রস্তুতই ছিলীম। কিন্তু তোমরা আমাকে ইংরাজীতে ষ্টুপিড্‌ ব'লে গালাগালি দিয়েছ, অতএব আমি তোমাদের অস্ত্র তোমাদেরই উপর

প্রয়োগ ক'রতে চাই, অর্থাৎ মানভরে চিৎ হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে পথ রোধ ক'রে তোমাদের কর্ম্ম পণ্ড ক'রতে চাই।

তখন আমার চারিদিকে বেশ ভিড় জ'মে উঠেছে। কেউ ব'লছে "জোর ক'রে উঠিয়ে দাও, কেউ ব'লছে "হাত পা ধ'রে পুকুরে ফেলে দাও," কেউ ব'লছে "মার—কে।"

আমি তখন ধীরে ধীরে উঠে প'ড়লাম, ব'ললাম "তোমাদের নন্-কো-অপারেশনের দৌড় কতটা, তাই দেখ্‌ছিলাম। এই বারে আমি উঠে যাচ্ছি। একটা কথা ব'লে যাই। গরীব-ব্রাহ্মণ অর্থাৎ দুর্ব্বলের উপর operation করবার প্রলোভনটা একদম ছেড়ে না দিলে বিশেষ সুবিধে হবে না। কেবল শুয়ে প'ড়ে পথ বন্ধ করাটুকুই যদি পুঁজি হয়, তাহ'লে কিন্তু রাজাকে চালমাৎ করা যাবে না।"

চারিদিক হ'তে বিদ্রূপের বর্ষণ হ'তে লাগলো। আমি পলায়নের উদ্যোগ ক'রলাম কিন্তু কতকটা দূর গিয়েই আর অগ্রসর হওয়া গেলনা। একটা প্রবল জনতার ঢেউ এসে আমাদের বিপরীত দিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। বিনা চেষ্টায় পা দুটো আপনিই চ'লতে লাগ্‌লো;—

শেষে দেখি যে আমি ঐ জনতার মধ্যে দণ্ডায়মান, এবং বক্তৃতা শুনতেও বাধ্য। কাঁচা পাকা নানারকম বক্তা ইংরাজী ও বাঙ্গালায় বক্তৃতা ক'রতে লাগলেন। স্বদেশীর যুগে বক্তৃতার পোকা ছিলাম, তার পর থেকে ও চাষটা আর বড় একটা করা হয় নি। বক্তৃতার বিষয়টা তখন যা ছিল এখনও প্রায় তাই আছে, কিন্তু সে যুগের মত এযুগে বক্তৃতাটা তেমন জ'মে উঠছে না। বাঙ্গালীর মন ভাবের তরঙ্গে তখন যেমন কাণায় কাণায় ভ'রে উঠেছিল আর সেই উচ্ছ্বাস তার কথায় ভাষায় ও গানে যে কাব্য ও কলা ফুটিয়ে তুলেছিল এখন কিন্তু তেমনটি হয় নি। "স্বদেশ" "বন্দেমাতরম্‌" "আমার দেশ" "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" এই সকল গালভরা কথাগুলোয় যেন মন্ত্রের শক্তি ছিল, কাণের ভেতর প্রবেশমাত্র প্রাণকে মাতিয়ে তুলতো; কিন্তু আজ কালকার "নন-কোঅপারেশান" এই বেসুরো বিজাতীয় আওয়াজে বাঙ্গালীর প্রাণটা যেন ভ'রে উঠ্‌ছেনা। আর এর তর্জমা যে "সহযোগীতা-বর্জ্জন"—বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায় ও রকম কটমট শব্দের কোনই স্থান নেই। ছেলেরা স্কুল-কলেজ ছাড়ছে বটে, কিন্তু ধরবার

মত একটা স্পষ্ট কিছু পাচ্ছে না। তখন ছাড়ার চেয়ে ধরার ঝোঁকটা বেশী ছিল, এখন ধরার চেয়ে ছাড়ার ঝোঁকটাই হ'য়েছে বেশী। হ'তে পারে এখনকার চেয়ে তখনকার আদর্শটা ছোট ছিল, আর সেই আদর্শে পৌঁছবার উপায়টাও ছোট ছিল, কিন্তু সেই উপায়টার মধ্যে একটা খুব বড় "হাঁ" ছিল। এখনকার আদর্শটা বড়, কিন্তু উপায়ের ষোল আনাই "না।" এই "না"র ভেতরে, এই নিষেধের ভেতরে আছে বিরোধ, আর বিরোধের ভেতরে "মোটেই" কাব্য নেই। প্রাণ যেখানে কাব্য শূন্য, বাক্য সেখানে স্ফূর্তিহীন। তাই সে যুগের ভাবসম্পৎ আর বাক্‌স্ফূর্তি আজকের বক্তৃতার মধ্যে মোটেই খুঁজে পেলাম না। আর এই জন্যেই সেকালে এক ডাকে সমস্ত বাঙ্গলাদেশ একযোগে সাড়া দিয়েছিল, আর এ কালে এত ডাকাডাকি এত সাধাসাধির পর কল্‌কাতার ও অপর কয়েক জায়গার স্কুল কলেজের ছেলে ছাড়া আর কারো মনই ভিজ্‌লো না, প্রাণই মাত্‌লো না। অনেক কষ্টে ছেলেদের মধ্যে যেটুকু কাজ হ'য়েছে সেটুকুও বজায় থাকে কি না এই আশঙ্কায় গুর্জ্জর থেকে শ্রীগান্ধীকে ছুটে আসতে হ'য়েছে।

এই তুলনার তাৎপর্য্য এ নয়, যে সেদিনকার হুজুগটা ছিল নির্দ্দোষ, আর আজকের হুজুগটা একেবারেই প্রাণ-শূন্য। বরং এখনকার আন্দোলনে ত্যাগের আদর্শটা বড়ই হ'য়েছে, রজোভাবটা বিশুদ্ধতর হ'য়েছে, এবং একটা spiritual tendency (অধ্যাত্মমুখী গতি) ফুটে উঠেছে। Tendency ব'লছি এই জন্যে যে আত্মশক্তির পরিচয়-লাভ এখনও ঘটেনি, প্রেমের অভিনয় চলছে মাত্র কিন্তু বিদ্বেষ-বুদ্ধিই হ'য়েছে প্রেরণার ভিত্তি। যাক্, সে কথা পরে হবে। আমি বলছিলাম যে এবারকার বক্তৃতার ভাব ও ভাষার দরিদ্রতাটা বেশ স্পষ্ট। অনেকে ব'লছেন, "এবারে কথা কম, কাজ বেশী। ন'মাস পরেই যখন কাজের হিসেব পাবার কথা, তখন এ সম্বন্ধে এখন নীরব থাকাই ভাল।

শ্রোতাদের মধ্যে মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রেরাও সমবেত হ'য়েছিলেন। একজন বক্তা উঠে ব'ললেন, "দেশে রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। গ্রামে গ্রামে ম্যালেরিয়া ও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী কালের করাল কবলে নিপতিত হইতেছে। পীড়িতের ক্লেশোপশম ও প্রাণরক্ষা অবশ্য করণীয়। মেডিক্যাল ছাত্রদিগকে এই নিরস্ত্র

স্বরাজ-সমরে আহ্বান করিতে আমার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিতেছে। রোগি-নারায়ণের শুষ্ক মুখের দিকে তাকাইয়া মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে এই নন্‌কো-ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে আমি আদৌ সম্মত নহি। আপনারা কি বলেন যে রুগ্ন ভ্রাতাভগিনীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা করিলে ভারতমাতা আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হইবেন?"—(জনতা হ'তে সহস্র-কণ্ঠে উত্তর হ'লো 'কথনই না' 'কথনই না')—এরূপ অবস্থায় আপনারাই বিচার করুন, মেডিক্যাল ছাত্র-দিগের পক্ষে কলেজ পরিত্যাগ করা উচিত কি না?"—(জনতা একযোগে গ'র্জ্জে উঠলো 'উচিত নয়' 'উচিত নয়') পরবর্ত্তী বক্তা উচ্চভূমিতে উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললেন, "ইহা ম্যালেরিয়া নিবারণী সভা নহে, অতএব আমরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ম্যালেরিয়ার প্রতিকার-কল্পে অদ্য রজনীতে (অর্থাৎ to night, যদিও বাঙ্গলা হিসাবে তথন বৈকালের অবসান, এবং মন্যুমেণ্টের চূড়া থেকে নীচের দিকটা অন্ততঃ ত্রিশ ফুট সূর্য্যদেবের সিন্দুরে আভায় ঝলমল ক'র্‌ছিল) আমরা এখানে সমবেত হই নাই। ভারতের ত্রিশকোটি নরনারী যে সন্তাপন্ন ব্যাধির যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে আমরা

এক্ষণে সেই ব্যাধির চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছি; যে ব্যাধির উপশম হইলে ম্যালেরিয়া ইনফ্লুয়েঞ্জা আদি তুচ্ছ-ব্যাধি-সকল, বিতাড়িত-শৃগালের ন্যায় ভারত হইতে চিরন্তরে নির্ব্বাসিত হইবে আমরা সেই ব্যাধির চিকিৎসায় এখন প্রবৃত্ত হইয়াছি (জনতা' হ'তে 'গুন গুন' ধ্বনি); যে ব্যাধির শতবন্ধনে আর বৃশ্চিকদংশনে আমরা উন্মত্তপ্রায় হইয়াছি, সেই দাসত্বব্যাধির চিকিৎসাতেই আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। উপনিষৎকার বলিয়াছেন, 'নাল্পে সুখমস্তি' (করতালি)। আপনারা কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাধির প্রতিবিধান করিতে গিয়া এই সুবর্ণ অবসর হেলায় হারাইবেন, না আপনারা মহা-আরোগ্য বা স্বরাজ চাহেন? (জনতা হ'তে সহস্র-কণ্ঠে উত্তর এল 'স্বরাজ চাই' 'স্বরাজ চাই')—স্বরাজই যদি আমাদের লক্ষ্য, তাহা হইলে এখন বলুন যে মেডিক্যাল কলেজকে অবিলম্বে বর্জ্জন করা উচিত কি না?"—(জনতা গর্জ্জে উঠলো 'নিশ্চয় উচিত' 'নিশ্চয় উচিত')।

শ্রোতৃমণ্ডলীর একটা প্রধান গুণই হ'চ্ছে এই যে তাদের গোঁড়ামীটা মোটেই নেই। যুক্তির সম্মুখে প্রাণটা নিরন্তর

উন্মুক্ত হ'য়ে র'য়েছে,—যাকে ইংরাজীতে বলে open to conviction; সে কারণ দেখতে পাওয়া যায়, যে এঁদের কাছে এই মুহূর্ত্তে যেটা যুক্তিযুক্ত এবং প্রশংসার্হ, পর-মুহূর্ত্তেই সেটা যুক্তি-বিরুদ্ধ এবং গর্হিত। আমার বিশ্বাস যে ঐ দ্বিতীয় বক্তার পর যদি কোন সাহসী বক্তা মেডিক্যাল কলেজ না ছাড়ার পক্ষ সমর্থন ক'রে জোর ভাষায় গোটা-কতক চোখা চোখা যুক্তি ছাড়তে পারতেন, তাহ'লে জনতা কখনই সে যুক্তির অবমাননা ক'রতো না, কেন না যুক্তির কাছে তারা সতত নতশির।

তারপর আরও দু'একজন যুবক বক্তা যা ব'ললেন তার সার মর্ম্ম এই যে শুয়ে শুয়েও খুব উচ্চশ্রেণীর বীরত্ব দেখান যায়। আমার কিন্তু মনে হয় যে চলাচলের পথ বন্ধ ক'রে পরের দরজায় শুয়ে থাকাটা non-violent নয়, অর্থাৎ প্রায় মার ধ'রেরই সামিল। হাত দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বাধা দেওয়া, পিছন ফিরে পিঠ দিয়ে বাধা দেওয়া অথবা পথ রোধ করে শু'য়ে থেকে বাধা দেওয়া—এসবই একজাতীয় ব্যাপার, কেবল লঘুগুরু ভেদ মাত্র। এ তিন ক্ষেত্রেই শরীরের বিরুদ্ধে শরীরকে ব্যবহার করে বাধা

দেবার আয়োজন র'য়েছে ; অর্থাৎ বাধাপ্রদানকারী নিজের শরীরকে পরের এলাকার মধ্যে এমন ভাবে স্থাপিত ক'রেছে, যাতে পরের পক্ষে শারীরিক বাধা দেওয়ার সম্ভাবনাটা খুবই বেশী। সে যাইহোক, শুয়ে শুয়ে ল্যাজ নাড়ার চেয়ে শুয়ে শুয়ে বাধা দেওয়া ভাল। আর এই রাধাকৃষ্ণের প্রেমের দেশে মানভঞ্জনের ব্যাপারটা যেন আমাদের মজ্জাগত। মান হ'তেও যতক্ষণ, ভাঙ্গতেও ততক্ষণ। যে সব বালক মান ক'রে ভাত খায় না, বা যে সব অবলা কথায় কথায় স্বামীর উপর অভিমান ক'রে বাপের বাড়ী যায় বা যেতে চায়, তাদের ত্যাগস্বীকার (self-sacrifice) এর স্থায়িত্ব বড় কম।

সভা ভঙ্গ হবার পর সাগরে তুফান উঠলে যেমন হয়, জন-তরঙ্গ সহসা সেই রকম সংক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠলো। ইতস্ততঃ চলমান হ'য়ে, গর্জ্জন ক'রে জয়ধ্বনি করতে লাগলো। যুদ্ধজয়ের পর সৈন্যগণ যে রকম উল্লাস করে এবং জয়ধ্বনি করে, এ উল্লাস এবং ধ্বনি তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ভিড়টা কমবার অপেক্ষায় আমি ঘাসের উপর ব'সে আছি, এমন সময়ে আমার এক সহপাঠী বন্ধুর পুত্র গোপাল

এসে প্রণাম ক'রে আমার পাশে ব'সল, বললে, "জ্যেঠা-ম'শায় কি বক্তৃতা শুন্‌তে এসেছিলেন নাকি ?" আমি ব'ললাম "না বাবা, একটু বেড়াতে এসে বক্তৃতার ফাঁদে প'ড়ে গিয়েছিলাম। তুমি কোন দিকে—C. O. না N. C. O.? সে হেসে বললে "N. C. O.;" আমি ব'ল্লাম, "ভালই হ'য়েছে, তোমার কাছে ব্যাপারটা একটু শোনা যাক্। কি রকম দাঁড়াবে বল ত ;—হুজুগটা দিন কতক টিকবে ত ?"

গোপাল ছেলেটি ভাল। এম-এ আর বি-এল দুই পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হ'চ্ছিল। সাধারণ পাশ-করা ছেলের মত নয়, বেশ একটু ধার আছে, ধীর এবং চিন্তা-শীল। টপ্ ক'রে আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। একটু থেমে ব'ল্লে "দেখাই যাক্ কত দূর গড়ায়। গান্ধী ত ব'লেছেন যে এটা একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র। অতবড় ত্যাগী আর আদর্শ পুরুষ যখন জোর ক'রে একটা পথ দেখাচ্ছেন আর তাঁর চেয়ে অধিক শক্তিশালী কোন নেতা দাঁড়িয়ে অন্য কোন পথও যখন দেখাচ্ছেন না, তখন তাঁর কথা না মেনে আমাদের উপায় কি ?"

আমি। ব'লেছ ঠিকই। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্যটা এই যে তোমরা গান্ধী মহারাজের কথাটা কি ধ'রতে পেরেছ, না শুধুই হুজুগে গা ভাসিয়ে দিয়েছ?

গোপাল। ঐখানেই ত গোল। অধিকাংশই হুজুগে মেতেছে। নিজে নিজে চিন্তা করবার অভ্যাস ছেলেদের নেই, আর সব ছেলেই যে স্বাধীন ভাবে চিন্তা ক'রে কাজে নামবে; এটা আশা করাও ভুল। হুজুগ উঠলো—কলেজ ছাড় আর অমনি সব কলেজ ছেড়ে দিলে। দেখছেন না আট দশ বছরের স্কুলের ছেলেরা অবধি স্কুল ছাড়ছে, আর ব'লছে "স্বরাজ চাই।" গান্ধী কলেজ ছাড়তে ব'লছেন, সে কথাটা আমরা শিরোধার্য্য ক'রে নিয়েছি, কিন্তু তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিলাস বর্জ্জন ক'রতে ব'লছেন, সকলের প্রতি, এমন কি ইংরাজেরও প্রতি বিদ্বেষ বর্জ্জন ক'রতে ব'লছেন প্রত্যেক ছেলেকে চরকা ঘোরাতে আর তাঁত বুনতে ব'লছেন, সে সব কথা বড় একটা মনে ধ'রছে না। কিন্তু চিন্তা করবার যাদের অভ্যাস আছে, তারাও গান্ধী মহারাজের কথায় বিশ্বাস স্থাপন ক'রতে পারচে না; অর্থাৎ স্বরাজ পেতে আর সেরেফ্ নয় মাস বাকি, এটা কিন্তু

আমাদের বিশ্বাস হ'চ্ছে না। তার পর আর একটা কথা বিশ্বাস করা আরও শক্ত। গান্ধীজী বলেন, "যে ভারতের শিক্ষিত সমাজ যদি এ আন্দলনে যোগ না-ও দেয়, তা হ'লেও ভারতের জন সাধারণ নাকি N. C.O. ক'রে ইংরাজের গর্ব্বিত হস্ত থেকে স্বাধীনতার নিশানটা কেড়ে নিতে সমর্থ।" ভারতের জনসাধারণকে যেন চিনি না, কিন্তু বাঙ্গলায় লোকচরিত্র একটু আধটু বুঝি ব'লেই বিশ্বাস। N. C.O. ক'রে স্বরাজ পেতে হ'লে যে রকম চরিত্র-বলের প্রয়োজন, বঙ্গেতর ভারতে যদি তা হ'য়ে থাকে, ভালই কথা; কিন্তু বাঙ্গলায় তা হয়নি; আর তা হ'লে বাঙ্গলার পক্ষে স্বরাজ লাভের সম্ভাবনাই বা কোথায়? আমার বিশ্বাস যে শিক্ষিত সমাজ থেকে একদল লোক সর্ব্বত্যাগী হ'য়ে, আত্মভোলা হ'য়ে, যদি জনসাধারণকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রতে পারে, চরিত্রের বলে গরীয়ান ক'রে তুলতে পারে, তবেই এ আন্দোলন সফল হবে। শিক্ষিত সমাজকে বাদ দিয়ে ভারতবাসী স্বরাজ-সাধনায় সিদ্ধি লাভ ক'রবে, এ কথা আর কেউ ব'ললে তাঁর আর কোন মতেই রক্ষা ছিল না, কিন্তু ব'লে-

ছেন যিনি তাঁর কথার প্রতিবাদ বা সমালোচনা ক'রতে যাওয়াটা এখন ভয়ানক দুঃসাহসের কাজ। ইংরাজী-পড়া শিক্ষিতসমাজের যত দোষই থাক্, তাদের গোলামী বুদ্ধি, বিলাসিতা আর বিজাতীয় মোহ প্রভৃতি যতই নিন্দনীয় হোক্, তাদেরই প্রাণ ফেটে যে ভাবগঙ্গা বেরিয়েছে তারই প্লাবনে ভারত উদ্ধার পাবে,—এ বিশ্বাস ছেড়ে দেওয়া বড়ই শক্ত। তাই ব'লছিলাম, গান্ধীজীর সকল কথায় অহেতুক বিশ্বাস স্থাপন ক'রতে পারিনি, অথচ তাঁর ত্যাগ বিশ্বাস নিষ্ঠা আর চরিত্রের প্রতাপও এমনি দুর্নিবার, যে তাঁর পথকে অনুসরণ করা ভিন্নও আর গত্যন্তর নেই। এই পথ ধ'রে চ'লতে থাকলে যে কোন না কোন দিন আমরা সিদ্ধি লাভ ক'রবো এ বিশ্বাসটুকু আছে ব'লেই এ পথে নেমেছি।

আমি। তা ভালই ক'রেছ। মানুষ ভেবে-চিন্তে যেটাকে কর্ত্তব্য ব'লে স্থির করে, তাতে শেষ অবধি লেগে থাকাই হ'লো ধর্ম্ম। আমি জিজ্ঞাসা ক'রছিলাম যে ছেলেরা কি বলে? তারা কি দিন কতক হৈ চৈ ক'রে আবার যে যার কলেজে ফিরে যাবে নাকি?

গোপাল। সেটা বলা একটু শক্ত! তবে অধিকাংশ নিশ্চয়ই ফিরে যাবে। যারা ফিরবে তারা যে শুধু বাঙ্গলা দেশের মাথা হেঁট কর্‌বে তা নয়' তাদের নিজেরও আত্মবিশ্বাসে এমনি একটা ঘা লাগবে, যে তারা এ জীবনে আর কখনও মাথা উঁচু ক'রে কোন মহৎ কাজে ব্রতী হ'তে পারবে না।" আপনি কি বলেন, আবার কি ঐ কলেজে আর ঐ ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যাওয়া উচিত?

আমি। তা' তোমার পক্ষে উচিত না হ'তে পারে, কিন্তু সকলের পক্ষেই যে উচিত নয় তা' কেমন ক'রে বলি? যদি কেউ ভেবে চিন্তে বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে বোঝে যে ফিরে যাওয়াই কর্ত্তব্য, তবে তার পক্ষে ফিরে যাওয়া নিশ্চয় উচিত। হুজুগে প'ড়ে ছাড়াও যেমন দোষ, আবার হুজুগে প'ড়ে ফিরে যাওয়াও তেমনি দোষ। বিবেক-বুদ্ধির সম্যক্ পরিচালনা ক'রে স্বাধীন ভাবে যা করা যায় তাই ভাল। তুমি হয়ত ব'লবে অনেকেরই বিবেকটা ভোঁতা আর বুদ্ধিটা কাঁচা। কিন্তু এ রকম ঝড়ের মুখে এঁটো পাতার মত উড়ে বেড়ানোর চেয়ে ঐ ভোঁতা আর কাঁচা বিবেক বুদ্ধির অনুসরণ করা ঢের ভাল। এ সম্বন্ধে আমার

মতামত যদি জিজ্ঞাসা কর, তা হ'লে আমি এই ব'লব যে শিক্ষার ব্যাপারটাকে সম্পূর্ণরূপে আমাদের হাতে না নিলে ভারত-উদ্ধার হবে না। ভারত-উদ্ধার ব'লতে তোমরা যা বোঝ আমি সে রকম বুঝি না। সে কথা এখন থাক্‌। শিক্ষার ভারটা কেবল নিজেদের হাতে নিলেই হবে না। খাঁটি স্বদেশীমতে স্বদেশী প্রণালীতে এই বিরাট অনুষ্ঠানকে গ'ড়ে তুল্‌লে তবে আমাদের ছেলে মেয়েরা মানুষ হবে। আমাদের লক্ষ্য মানুষ হওয়া। তা' মানুষ হ'তে গেলে যা' যা' করা উচিত, তাই ক'রতে গিয়ে যদি স্বরাজ এসে যায় আসুক, না আসে না আসুক। এখন স্বরাজটা ত পাওয়া যাক্‌, তার পর দেবলোকের আইন-কানুন স্বদেশী পার্লামেন্টে পাশ ক'রে দেশের লোককে মানুষ ক'রে নেওয়া যাবে—এ কথার কোন মানে হয় না। "এখন সব শিক্ষাদীক্ষা মুলতবি থাক্‌, স্বরাজ প্রতিষ্ঠার পর তবে আমাদের প্রকৃত শিক্ষা আরম্ভ হবে"; Education can wait, but Swaraj cannot— এ কথাও আমার বুদ্ধির অগম্য। যদি মানুষ না হ'য়েই স্বরাজ পাই তা হ'লে ঐ স্বরাজ আমাদিগকে আরও অমানুষ

ক'রে তুল্‌বে না তার নিশ্চয়তা কি? আমার বিশ্বাস, গভীর বিশ্বাস এই যে আমাদের মানুষ হবার পথে বাহিরের কোন বাধাই আমাদের গতিরোধ ক'রতে সমর্থ নয়। স্বয়ং শয়তান যদি সদলবলে আমাদের উপর রাজত্ব ক'রতে আসে, তা হ'লেও মানুষের অন্তরাত্মার ব্যাকুল প্রয়াসকে ব্যর্থ ক'রতে পারে না আর মানুষের অন্তরাত্মা যদি নিজের সার্থকতাকে ভুলে থাকে, তা হ'লে সাক্ষাৎ বিষ্ণু এসে রাজদণ্ড ধারণ ক'রলেও ভদ্রস্থ নেই।

গোপাল। আপনি যা ব'লছেন, তা কিন্তু মোটেই বুঝলাম না। আপনার কথার ভাবে যেন বোধ হ'চ্ছে যে স্বাধীনতার কোনই মূল্য নেই। মাপ ক'রবেন, আমি হয়ত ভুলই বুঝ্‌ছি; কিন্তু আমার মনে হয় যে স্বাধীনতার অভাবে কিছুতেই মানুষের মনুষ্যত্বের উন্মেষ হ'তে পারে না। উঠতে ব'সতে যাকে পরের তাঁবেদারী ক'রতে হয় যার গ্রাসাচ্ছাদন পর্য্যন্ত প্রতিপদে পরের আইনের দ্বারা সঙ্কটাপন্ন, তার আবার মনুষ্যত্ব বিকাশের সম্ভাবনা কোথায়? এই জন্যই সকল দেশের মনীষিগণ স্বাধীনতা-কেই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও প্রেয় বস্তু ব'লে নির্দ্দেশ

ক'রে গিয়েছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের পৃষ্ঠা সেইগুলি যাতে স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য আত্মোৎসর্গের কথা লেখা আছে। স্বাধীনদেশের হাওয়াই আলাদা। স্বাধীন দেশের একটা মজুরের প্রাণেও যে জীবনের স্পন্দন, যে শক্তির যে খেলা দে'খতে পাই, পরাধীন দেশের পণ্ডিতের মধ্যেও তার অভাব। সেই জন্যে স্বাধীনতাকেই আমরা জীবনের সার বস্তু ও চরম সার্থকতা ব'লে মেনে নিয়েছি, আর সর্ব্বাগ্রে এই স্বাধীনতা লাভের জন্যই আমাদের চেষ্টা।

আমি। বুঝলাম তোমার কথা। কিন্তু তোমার ও স্বাধীনতার স্তুতিগানে এ প্রাণ আর মেতে উঠতে চাইছে না। ছিল একদিন যখন স্বাধীনতার নামেই প্রাণটা পাগল হ'য়ে উঠতো। Liberty, freedom প্রভৃতির গুণগান শ্রবণে এবং ভাবনায় স্বেদ পুলক রোমাঞ্চ হ'ত;—এর বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই মনে ঠাঁই পেত না। তখন ইংলণ্ড ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের মানুষগুলো স্বাধীনতার প্রসাদে মনুষ্যত্বের চরম সোপানে উঠেছে ব'লে মনে হ'ত। ওদের বাণিজ্য বিজ্ঞান সাহিত্য কলা সবই যেন ওদের স্বাধীনতার

স্তুতিবাদে মুখর হ'য়ে আমাদিগকে ধিক্কার দিত। কিন্তু সে মোহ, বাবা, ভেঙ্গে গেছে। গত যুদ্ধের ব্যাপারে ওদের স্বাধীনতার ও সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপটি যখন ফুটে বেরুলো, তখন দেখা গেল যে কেবলি "উপরে চাকুন চুকুন, ভিতরে খ্যাড়ের বোঝা।" গণতন্ত্র, লোকমত, ভোট, ফ্রাঞ্চাইজ ও-সব ঝুটো মাল। এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, কোন দেশই স্বাধীনতা পায় নি। আমরা যেমন "স্বরাজ স্বরাজ" ব'লে চীৎকার ক'রছি, ইউরোপও তেমনি ক'রছে। ওদের যা নেই, ওরা আমাদের তা দেবে কি ক'রে? ওদের মধ্যে যে এত শক্তির খেলা দেখতে পাও, তার অধিকাংশটাই নেশার ছটফটানি। সাম্রাজ্যের গর্ব্বে আর টাকার গরমে ওরা মাতাল হ'য়ে আকাশ পাতাল এক ক'রছে বটে, কিন্তু ওদের প্রাণের ভেতরটা যদি দেখ, ত বুঝবে যে ওরা আমাদের চেয়েও কৃপার পাত্র। অবিশ্যি আমাদেরও রোগের অবস্থাটা ভাল নয়, কিন্তু সেটা একটু অন্য রকমের। নাড়ীটা খুব ক্ষীণ হ'লেও নেহাত এলোমেলো নয়। এখনও সুচিকিৎসা হ'লে বেঁচে উঠবে, কিন্তু আনাড়ী বৈদ্যের ওষুধ খেলেই

দম বেরিয়ে যাবে। সেই হাকিম সাহেবের গল্প শোননি? আর্‌বি পুঁথি পড়ে যখন চিকিৎসাশাস্ত্রে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি হ'ল, তখন হাকিম সাহেব এক সহরে এসে দাওয়াইখানা খুল্‌লেন। কম্‌জোরীর দাওয়াইটা সকলেই চায়, তাই তিনি বেনের দোকান থেকে যতরকম তেজস্কর উগ্রবীর্য্য ভেষজ পেলেন, তা সংগ্রহ ক'রে আন্‌লেন। তার সঙ্গে ধাতুর ভস্ম টস্ম মিশিয়ে যখন বড়ি পাকাচ্ছেন, তখন এক-জন শীর্ণদেহ যুবক এসে চিকিৎসাপ্রার্থী হ'ল। হাকিম সাহেব তাকে দেখেই ব'ল্লেন, "তোমার মত রোগীর জন্যই আমি এই 'তাকৎ কি দাওয়াই' বানিয়েছি। বাঃ, তুমি ত ঠিক সময়েই এসেছ দেখছি। এই নাও তোমার দাওয়াই, একেবারে তাজা।" এই ব'লেই তাকে কতক-গুলো বড়ি দিয়ে, সেবনের ব্যবস্থা ব'লে দিলেন। মরিজ্‌ চ'লে গেলে, হাকিম ভাবলেন, কেমন দাওয়াই বানালাম একমাত্রা খেয়েই দেখা যাক্‌। এই ভেবে এক মাত্রা তিনি নিজেও খেলেন। এদিকে রোগী বাড়ী এসে ঔষধ সেবন ক'রে গরমে ছটফট ক'রতে লাগ্‌লো। এমনি গাত্র-দাহ, যে কিছুতেই স্থির থাকতে না পেরে নদীর দিকে

ধাবমান হ'লো। নদীর কূলে এসে দেখে যে হাকিমসাহেব নদীজলে আকণ্ঠ নিমজ্জমান। যুবক ছুটে এসে জলে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ব'ল্লে "প্রাণ যায়, হাকিম সাহেব বড় বিপদ।" হাকিম সাহেব কাতর কণ্ঠে ব'ললেন, "আর বাবা, আমারই বা কোন সম্পদ!" তাই ব'লছিলাম যে ওদের দেওয়া স্বরাজ নিয়েছ কি ম'রেছ। ভুলে যেওনা যে আমাদের সাধনায় ভারতে একটা নূতন রকমের স্বরাজ গ'ড়ে উঠবেই, আর সেই স্বরাজ আমরা পৃথিবীকে যতদিন না দিতে পারব ততদিন পৃথিবীর উদ্ধার নেই। সেই স্বরাজ গড়ে তোলবার পরিবর্ত্তে যদি কোন বাজেমার্কা স্বরাজ এসে ঘাড়ে চেপে বসে, তাহ'লে শুধু ভারতের নয় পৃথিবীরই অমঙ্গল। নয়মাস বা এক বছরের মধ্যে ইংরাজ যদি হাত গুটিয়ে বসে আর আমাদের উপর সব ছেড়ে দেয়, অথবা তাল্পো-তাড় গুটিয়ে হোমে চ'লে যায়, তা হ'লে ছত্রিশ রকমের স্বরাজ গড়বার জন্যে ছত্রিশটা দল চারিদিক থেকে চাগাড় দিয়ে উঠবে। তখন হিন্দু মুসলমানের পীরিতের প্রকৃত চিত্র প্রকাশ পাবে। জাতে জাতে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে, মতে মতে,

কাণ্ড উপস্থিত হবে, তা বর্ণনা না ক'রে অনুমান করাই ভাল। তার পর এই অবসরে জাপান আছেন, আফগান আছেন, বলসেবী আছেন। সে চিত্র আর স্পষ্ট ক'রে এঁকে লাভ কি? এই রকম একটা ব্যাপারই যদি ভগবানের অভিপ্রেত হয়, তা হ'লে একজন গান্ধীর বক্তৃতায় দেশে শান্তি স্থাপন হবে না। শান্তিতেই হোক্ আর রক্তপাতেই হোক, স্বরাজ পাবার আগে কিঞ্চিৎ মনুষ্যত্বের অর্জ্জনটা নেহাৎ দরকার। একজন গান্ধীর জয়ঘোষণা ক'রতে ক'রতে কতটুকু অগ্রসর হ'তে পারবে? গান্ধীর অবরোধে (ভগবান তাঁহাকে নিরাপদে রাখুন) অথবা অবর্ত্তমানে (ভগবান তাঁহাকে চিরজীবি করুন) তোমরা কার মুখ চেয়ে এই স্বরাজ সমরে আত্মবলি দেবে? আমরা বহু গান্ধী চাই এবং সে জন্য শিক্ষাদীক্ষা আর সাধনার সহায়ে আমরা আগে মনুষ্যত্বের বিকাশে মনোযোগী হ'তে চাই।

গোপাল। আপনার কথা শুনে আমার মনে ক'য়েকটি প্রশ্নের উদয় হ'চ্ছে। প্রথমেই যে প্রশ্নটা মনে উঠছে সেটা হ'চ্ছে এই, এত বড় একটা বিরাট আন্দোলন, যাতে সমগ্র

বাঙ্গলার যুবকবৃন্দ কলেজ স্কুল ছেড়ে দেশের জন্য জীবনোৎসর্গ ক'রতে দাঁড়িয়েছে, এর অর্দ্ধেকও যদি শেষ অবধি সঙ্কল্পে স্থির থাকতে পারে তা হ'লে দেশ স্থায়ী মঙ্গলের দিকে বহুদূর অগ্রসর হ'তে পারবে কিনা ?

আমি। আন্দোলনটা বিরাট বটে। সত্যি সত্যি আবার যেন ভাবের নদীতে বাণ ডেকেছে। অনেক সঞ্চিত আবর্জ্জনারাশি এই স্রোতে ধুয়ে ভেসে যাবে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই প্লাবনে কত গ্রাম অদৃশ্য হবে, কত গৃহস্থ গৃহশূন্য হবে, কালের দুরন্ত সংহারে কত প্রাণে হাহাকার উঠবে, তা কে সংখ্যা ক'রবে ? যারা বুদ্ধিবিচার ক'রে ঘরের জঞ্জালকে অপসারিত ক'রে নিজেদের স্বাস্থ্যরক্ষা ক'রতে জানেনা, প্রকৃতি স্বয়ং তাদের জঞ্জালকে দূর ক'রতে আসে বটে, কিন্তু অতি রুদ্রমূর্ত্তিতেই সে এই কার্য্য ক'রতে আসে। ঝঞ্চা আর বজ্র বায়ুমণ্ডলকে নির্ম্মল করে বটে, কিন্তু বৃক্ষে বৃক্ষে, গৃহে গৃহে সংহারের করাল চিহ্ন রেখে যায়। যদি শুধু ভাবের প্লাবনে দেশের সংস্কার করবার সাধ বাঙ্গালীর হ'য়ে থাকে, তবে সংহারের প্রচণ্ড তাণ্ডবের সন্মুখীন হবার জন্যেও যেন সে প্রস্তুত থাকে।

জানি বাঙ্গলা দেশ ভাবের দেশ। বাঙ্গলার মাটির ওপরে আজকের এই ভাবের ঢেউ নিতান্ত নূতন জিনিষ নয়। ভাব জিনিষটা যতই বড় হোক্ আর যতই ভাল হোক, শক্তিহীনের পক্ষে তার ফলটা খুব ভাল হয় না। দুর্ব্বল দেহে যেমন সবল নাড়ী প্রায়ই মারাত্মক, লঘু আধারের পক্ষে গুরু আধেয় যেমন নিরাপদ নহে, অনধিকারীর পক্ষে শক্তি সম্পন্ন বীজ যেমন অনিষ্টকর, লঘুচিত্তে ভাবাবেগ তেমনি অশুভশংসী। এমন কি ভগবদ্‌ভক্তির ভাব পর্য্যন্ত এ নিয়মের বাহিরে নয়। গৌরাঙ্গ ঠাকুরের অমন ভক্তির ধর্ম্ম, তাঁর তিরোভাবের পর, জ্ঞানের রজ্জুর দ্বারা সংযত না হওয়ায় বাঙ্গলাদেশে যে অধঃপতন ঘটিয়েছিল তার ফল বাঙ্গালী এখনও হাড়ে হাড়ে ভুগ্‌ছে। পরে, বাঙ্গলার নাট্য কলায় যে ভাবের আতিশয্য বাঙ্গালী জীবনকে আন্দোলিত করেছিল, তার ফলে সমগ্র বঙ্গ বহুকাল যাত্রা পাঁচালী তরজা আর কবির লড়াইয়ে মত্ত হ'য়ে বহুদিন সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম আর মনুষ্যত্বে জলাঞ্জলি দিয়েছিল। আর ইংরাজী সাহিত্যের ভাবটা যখন বাঙ্গালী উদরস্থ ক'রলে,

যে প্রকাশ্যভাবে গোমাংসভক্ষণই তখন হ'য়েছিল সৎসাহসের (moral courage) উৎকৃষ্ট পরিচয়স্থল। সৌভাগ্যক্রমে সে ভাবতরঙ্গ জনসাধারণে সংক্রামিত হবার সুযোগ ঘটেনি, কিন্তু শিক্ষিত সমাজ সেদিনকার সেই বিজাতীয় সম্মোহনের জালকে এখনও সবখানি ছিঁড়ে ফেলতে পারে নি। তার পর 'স্বদেশী' যুগে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা বা স্বদেশপ্রেমের ভাবে দেশ মেতে উঠেছিল, কিন্তু যুবকের দল সে উন্মাদনার বেগকে সংবরণ ক'রতে না পেরে দস্যুবৃত্তি ক'রে কাজ পণ্ড ক'রলো। বাঙ্গালী জীবনে এই সব ভাবের তরঙ্গ প্রতিবারেই অবশ্য কিছু কিছু মঙ্গল প্রসব ক'রেছে, কিন্তু প্রতিবারেই ভাবের উত্তেজনা ধারণাশক্তির অভাবে কুপথে ধাবিত হ'য়ে কত অনর্থই না সৃষ্টি ক'রেছে। এই রকমে শক্তির অত্যধিক অপচয় ক'রে, অত্যল্প লাভ ক'রতে ক'রতে অগ্রসর হ'লে কতদিনে আমাদের অবস্থা ফিরবে ?

এবার তোমাদের বিশেষ সাবধান হ'য়ে অগ্রসর হ'তে হবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আন্দোলনের তুলনায় এবারের ভাবপ্রবাহে একটা বিশেষত্ব আছে ব'লে মনে হয়। এবারে আমরা সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভর হ'য়ে অগ্রসর হ'তে চেয়েছি

—একথাও যদি শুধুই ভাবের স্ফুলিঙ্গ না হ'য়ে প্রাণের কথা হয়, তা হ'লে সর্ব্বাগ্রে আমাদের শক্তি সামর্থ্যকে বেশ ক'রে বিশ্লেষণ করে দেখবার দরকার হ'য়েছে। এবারে আগেই বুঝে নিতে হবে যে কিরূপ চরিত্রবলের অধিকারী হ'লে আমরা এই ভাবের প্রবাহকে সংযত ক'রে উত্তম প্রণালীতে সঞ্চালিত করতে পারবো। ভাবকে আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে না দিয়ে এবারে আমাদের চরিত্রের প্রভাবকে আমাদের ভাবের প্রভুরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। একেত আমরা ভাবপ্রবণ জাতি, তাতে আবার যাঁরা এই আন্দোলনে মেতে উঠেছেন, তাঁদের যৌবনাবেগ এই ভাবোন্মাদকে আরও উদ্দাম ক'রে তোলবারই সম্ভাবনা। তোমরা যে কলেজ ছেড়েছ, তা ভালই ক'রেছ, কেবল ভাবের ঝোঁকে ছেড়েছ ব'লে যা আশঙ্কা। তা' বাবা, স্বরাজ পাও আর নাই পাও, সাম্‌নে ওই যে অট্টালিকা দেখ্‌ছ—ওর ভেতরে আর ঢুকো না। সে যাই হোক্ শুধু কলেজ ছাড়লেই যে স্বাধীনতার দিকে অনেকখানি এগিয়ে যেতে পারবে, এরকম মনে করবার কোন কারণ দেখছি না। এখনও

যদি কেবল ভাবের তোড়ে ভেসে [illegible] গিয়ে চরিত্র অর্জ্জন করবার দিকে কঠিন পণ কর, তা হ'লে স্বরাজ ত পাবেই, তার চেয়েও বড় জিনিস তোমাদের করতলগত হবে। আর সেই জিনিসটি যতক্ষণ না পাচ্ছ, ততক্ষণ ভারতের জীবনসমস্যার পূরণ হবে না। আমার কথা বিশ্বাস কর, ভারতের অন্তরাত্মা স্বরাজের জন্য মোটেই ব্যাকুল নয়। কেবল ভারতবাসীই বিপন্ন হ'য়ে উদ্ধারের পথ খুঁজছে, তা নয়। দেখতে পাচ্ছনা, সমস্ত জগৎ কি রকম অশান্ত হ'য়ে উঠেছে। অন্যান্য দেশে ত স্বরাজ জাজ্বল্যমান হ'য়ে বিরাজ ক'রছে, তবে তাদের এত ছটফটানি কেন? সমগ্র মানবের দ্বিতীয়বার জন্ম হ'চ্ছে। মানুষ জড়ের পূজা ছেড়ে, দ্বিজ হ'য়ে আত্মার পূজার উপচার সংগ্রহ করবার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছে। এই যে আমাদের স্বরাজের জন্য এত আস্ফালন, এও প্রচ্ছন্নভাবে সেই আত্মানুসন্ধানেরই সূত্রপাত। ভারতকে জগতের গুরুর আসন গ্রহণ ক'রে একটা বৃহত্তর পূর্ণতর জীবনের সমাচার সকলকে শোনাতে হবে। তোমরা স্বরাজ নিয়ে পাগল, আর আমি তার চেয়ে বড় ভাব নিয়ে পাগল। তোমরা কি এই পাগলামির মর্ম্মবোধ ক'রে

কঠোর তপস্যা এবং নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন ক'রতে প্রস্তুত আছ?

গোপাল। আপনি যে আদর্শের কথা বলছেন, আমাদেরও সেই আদর্শ। প্রভেদটা কেবল এই দাঁড়াচ্ছে যে আপনি এই বড় আদর্শটাকেই এখনি দেশের সম্মুখে ধরতে ব'লছেন, আর আমরা প্রথমে স্বরাজের আদর্শটাকে লাভ ক'রে তারপর ঐ আদর্শে পৌছবার আয়োজন ক'রবো। স্বরাজ পেলে তবে ঐ বড় আদর্শে উপনীত হওয়া যত সহজ, প্রতিকূল শাসনপ্রণালীর অধীনে থেকে তত সহজ নয়। আর আপনি যে ব'লছেন যে অন্যান্য দেশ স্বরাজ পেয়েও মনুষ্যত্ব পায়নি অতএব স্বরাজ পেলেই আমাদের মনুষ্যত্ব-লাভের পথ উন্মুক্ত নাও হ'তে পারে, তার উত্তরে আমি এই ব'লতে চাই যে, অন্যান্য দেশ যেমন স্বাধীন অবস্থায় নিজ নিজ চরিত্রগত বা আদর্শগত বিশিষ্টতাকে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছে, ভারতবর্ষকেও তেমনি স্বাধীন হ'য়ে তার চরিত্রের বা আদর্শের বিশিষ্টতাকে বিকশিত করে তোলবার অবসর দেওয়া হোক। চোর যদি স্বাধীনতা পায় তবে তার চৌর্য্য বেড়ে যায়। আর সাধু যদি স্বাধীনতা পায়,

তবে তার সৎকর্ম্মের অবসর বেড়ে যায়। তেমনি ভারত-বর্ষও স্বাধীনতা পেলে সে কখনই অন্যান্য জাতির মত তার অপব্যবহার ক'রবে না, কিন্তু তার প্রাচীন আদর্শ তার সনাতন ধর্ম্মের আদর্শকে অনুসরণ ক'রে নিজেও সার্থক হবে এবং জগতেরও কল্যাণ করবার অবসর পাবে। সুতরাং আগে স্বরাজ, পরে জগতের হিত।

আমি। তোমার যুক্তির ভেতরে একটা মস্ত বড় ভুল র'য়েছে এই যে, কোন ব্যক্তির বা কোন জাতির আদর্শ দুটো হ'তে পারে না। এক সময় একজন ব্যক্তি বা একটা জাতি দুটো আদর্শের অনুগামী হ'তে পারে না। তা হ'লে বড় আদর্শটাকে আদর্শ ব'লে মেনে নিতে হবে আর ছোট আদর্শ যেটা বলছ সেটাকে ঐ বড় আদর্শের উপায়রূপে স্বীকার করতে হয়। তা হ'লেই কথাটা এই রকম দাঁড়ালো যে আমার আদর্শে পৌঁছবার জন্যে তুমি স্বরাজকে উপায় ব'লে গ্রহণ ক'রছ। কিন্তু আমি তোমাকে পূর্ব্বে ব'লেছি এবং আবার বলছি যে আমাদের আদর্শ হ'ল পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের বিকাশ আর এই মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বরাজের বিশেষ যোগাযোগ নাই।

অর্থাৎ কথা হ'ল এই যে স্বরাজলাভ এই আদর্শের অব্যর্থ উপক্রম নহে। কথাটা পরিষ্কার বোঝা দরকার যে স্বরাজ পেলে মনুষ্যত্বলাভ হতেও পারে আবার নাও হতে পারে। বরং স্বরাজ পেলেই মনুষ্যত্বলাভটা যে খুব সুলভ হবে না, তার বহু নিদর্শন বর্ত্তমান ;—যথা পণ প্রথার উচ্ছেদ করা রাজবিধির বিরুদ্ধ নয়, তথাপি দিবারাত্র ঐ প্রথাকে আমরা নিন্দা করলেও ওটাকে উঠিয়ে দিতে গেলে যে শক্তির দরকার সে শক্তি আমাদের নেই ; অস্পৃশ্য জাতিগুলোর সঙ্গে একটু সদ্ব্যবহার করলেই ওরা পরকীয় ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে না। এ কথা জেনেও আমরা ওদের মানুষ বলে গণ্য করতে শিখলাম না। স্বদেশের শিল্পজাতকে রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য তা বুঝেও বিদেশজাত বিলাসদ্রব্যের মোহকে পরিত্যাগ করতে আমরা প্রস্তুত নই—এই রকম বহু ব্যাপার বিদ্যমান যা থেকে স্পষ্ট বুঝা উচিত যে আমাদের চরিত্রই প্রথমে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। ভারতবাসীর চরিত্রগত বা আদর্শগত বিশেষত্বের কথা যে বলছে তা এখন মোটেই মনুষ্যত্বের অনুকূল নয়, দেশের লোকের অবস্থা যে একটু জানে তাকে

এ কথা বোঝাতে বেশী বেগ পেতে হবে না। এমন দিনে যদি আবার বিলিতি স্বরাজের আমদানি হয়, তাহ্‌লে আবার গোদের ওপর বিষফোড়া হ'য়ে বিপদটা বেশী ঘনিয়ে উঠবে মাত্র। আমার বিশ্বাস ভারত এই পৃথিবীব্যাপী উৎকট রকমের স্বাধীনতা বা স্বরাজরূপ ব্যাধির প্রতীকারের পথ দেখাবে। প্রতীকার চেষ্টার পরিবর্ত্তে রোগাক্রান্ত হ'য়ে পড়বার সম্ভাবনা দেখেই আমরা শঙ্কিত। তা ছাড়া এই রকম ঝুটো স্বরাজকে যদি আদর্শ বলে দেশের লোকের সামনে ধরো, তা হ'লে ইংরাজের প্রতি একটা বক্রদৃষ্টি থেকেই যাবে—তাতে বৃথা একটা বিরোধ এবং বাধার সৃষ্টি হবে। স্বরাজ, নন্‌-কো-অপারেশন ওসব কথাগুলো একেবারে ভুলে গেলে কাজের ঢের সুবিধা হবে। যদি ইংরাজের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষা করে কাজ হাসিল করতে পার ভালই, কিন্তু তা যদি না পার তবে বরং ভুলে যাও যে ইংরাজ বলে কেউ আমাদের দেশে আছে, ভুলে যাও যে তাদের তাড়াবার জন্যে বা জব্দ করবার জন্যে আমাদের কোমর বেঁধে দাঁড়ানো দরকার। ইংরাজকে কেবল তার প্রাপ্য গণ্ডা খাজানা দিতে থাকো আর রাজনীতির সকল

সম্পর্ক ছেড়ে দিয়ে একটা মনুষ্যত্বের আন্দোলন কর, একটা প্রেমের propāganda আয়োজনে গেলে যাও, সকল বুদ্ধি কৌশল প্রয়োগ ক'রে, সকল প্রাণ ঢেলে দিয়ে কেঁদে গিয়ে দেশের লোকের পা জড়িয়ে ধর আর বল যে এস আমরা বিলাসব্যসন ছেড়ে দিই, এস আমরা মামলাবাজি বন্ধ করে দিই, এস আমরা মদ গাঁজা ছেড়ে দিই, এস আমরা গাঁয়ে গাঁয়ে ম্যালেরিয়ার উচ্ছেদ করবার জন্যে সকলে মিলে পরিশ্রম করি। ইংরাজিতে রাজনীতির গলাবাজী ছেড়ে দাও, ইংরাজী শাসনযন্ত্রকে 'শয়তানের-গবর্ণমেণ্ট' ব'লে গালাগালি করলে লোকসান আছে, লাভ নেই। নিজেদের শয়তানী দূর করবার দিকে নজর দাও। পারবে? তিন হাজার পাগলা ছেলে হিসাববুদ্ধি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে? দেশের জন্যে, মানুষের জন্যে, ভগবানের জন্যে, সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে নিত্যানন্দের মত প্রেমে পাগল হ'য়ে ছুটে আসতে পারবে? ওকি অঙ্ক ক'সে মেপে জুকে ওজন ক'রে কপট প্রেমের ছলনা করতে দাঁড়িয়েছ? এমনি ক'রে ফাঁকি দিতে পারবে ভেবেছ মানুষ কি এতই বোকা যে তাকে ছুটো ছেঁদো কথায় ভুলিয়ে দেবে?

গোপাল। কিন্তু আবার হরিনাম আর প্রেমের আন্দোলনে মাতামাতি হ'লে তার প্রতিক্রিয়া ফলে আবার একটা অবসাদ আসবে নাকি? নামে আর প্রেমে আমাদের পরাধীনতাটা ঘুচবে কি?

আমি। উন্মাদনা অধিক হ'লে উপচিত্ত হ'য়ে কতকাংশ বিপথে যাবেই। তজ্জন্য যথাসম্ভব আমাদের ধারণাশক্তিকে বাড়িয়ে ভাবতরঙ্গের সম্মুখীন হ'তে হবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ববারে এই ধারণাশক্তির বৃদ্ধিকল্পে আমরা আদৌ মনোযোগ দিই নি। এবারে সতর্ক হ'য়ে ভাবগ্রাহী হ'তে হবে, তা ছাড়া আর উপায় কি আছে। হরিনামে দেশকে মাতিয়ে তুলতেই হবে। এতে মানুষ ঠাট্টা বিদ্রূপ ত করবেই। কিন্তু তবুও তাদের কাণের কাছে ঢাক-ঢোল পিটে হরিনাম ক'রতে হবে। এই তামস জাতের ভেতরে রজোভাব ঢোকাতে হ'লে তাণ্ডব নৃত্যে হরিনাম ভিন্ন আর গতি নেই। এ তামসিকতাকে ভেদ করে রজোগুণে পৌঁছতেই হবে। যদি ভাল দিক দিয়ে, প্রেমের দিক দিয়ে রজোভাবকে জাগিয়ে না তোল, তা হ'লে হিংসার দিক দিয়ে ঐ ভাব ফুটে উটবে।

হরিনাম উচ্চারণ মাত্র মানুষের মনে একটা পাবনী শক্তির খেলা আরম্ভ হয়। ক্রমাগত এই নাম ক'রতে ক'রতে মানুষের ভিতরের দেবতা জেগে ওঠেন। ভগবান মানুষকে এই নামের শক্তি বুঝিয়ে দেবার জন্যে গোরা হ'য়ে বাঙ্গলায় নেচে গিয়েছিলেন। তখন নদীয়ার তর্ক-মূলক নাস্তিক্যবাদ জ্ঞানের নাম গ্রহণ ক'রে গর্ব্বে আস্ফালন ক'রছিল, গোরা এসে সেই ঝুটো জ্ঞানকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন,—আর এই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, নামের সঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞানের অস্তিত্ব অসম্ভব। যেখানে নামের প্রতাপ নেই, সেখানে হরিপ্রেম নেই, যেখানে হরি-প্রেম নেই, সেখানে মানবপ্রেম নেই, যেখানে প্রেম নেই সেখানে জ্ঞানের উদয় অসম্ভব। তাই নদীয়ার নৈয়ায়িক পণ্ডিত বা পাষণ্ডদের জ্ঞানের ভ্রূকুটি ও বাগজালকে তিনি নামের প্লাবনে ভাসিয়ে দিয়ে দেশকে রক্ষা করেছিলেন। তার পরে এই ভাবোদ্যমের প্রতিক্রিয়া হ'য়ে দেশে নেড়া-নেড়ির সৃষ্টি হ'য়েছিল ব'লে নামের মাহাত্ম্য কিছুমাত্র কমে যায় নি, এবং গৌরাঙ্গদেবকে এই অনিষ্টের মূল কারণ ব'লে সাব্যস্ত করবার কোন কারণ উপস্থিত হয় নি। সেবারে

নাম আর প্রেমের শক্তিকে ধারণ করবার জন্যে আমাদের মন ষোলআনা প্রস্তুত ছিল না। তখন মুক্তির আদর্শটা খুব বড় হ'য়ে মানুষের মনে ফুটে ওঠে নি, সেই ধর্ম্মসমন্বয়ের ওপরে একটা বিরাট সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম মানুষের মনে জেগে ওঠেনি। সেই দিনে আর আজকার দিনে আশমান জমিন তফাৎ। তা ছাড়াও জানা উচিত যে এই রকমে ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়ার ধারাবাহিক স্রোতের প্রবাহেই মানুষের মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশ। যীশু প্রেমের জয়গান গেয়ে ক্রুশে জীবনোৎসর্গ ক'রেছিলেন এবং এই প্রেমের শক্তির প্রতিক্রিয়ার বশে খৃষ্টানেরা পরস্পরে কাটাকাটি ক'রে ম'রছে, এই রকম যুক্তি-প্রণালী অবলম্বন ক'রে যারা যীশুকে বা তাঁর প্রেমের ধর্ম্মকে অবজ্ঞার বা উপহাসের সামগ্রী বোধে ভ্রূকুটি করে, তাদের চেয়ে কৃপার পাত্র এ জগতে আর কে আছে? উঠ্‌তে উঠ্‌তে পড়তে পড়তে এগিয়ে যাওয়াই হ'ল প্রকৃতির নিয়ম। কে এমন মূর্খ আছে যে প্রতিক্রিয়ার ভয়ে এগিয়ে যাওয়া বন্ধ ক'রে ব'সে থাক্‌তে রাজী হবে, প'ড়বার ভয়ে উপরে উঠার বিরোধী হবে? তাই বলি, আবার আমাদের প্রেমের মহা-আন্দোলন ক'রে

নূতন ক'রে ভাবের বন্যা প্রবাহিত ক'রতে হবে। হরিনামের একটা বিপুল তরঙ্গ তুলে দেশকে ভাসিয়ে দিতে হবে। যদি বল, এই রকমের ভাবের চেষ্টায়ে দেশের অনিষ্টেরও সম্ভাবনা আছে, তার সোজা উত্তর এই যে মানুষের জীবনে ভাবের তরঙ্গপ্লাবন একটা অনিবার্য্য নৈসর্গিক ব্যাপার। ভাবের উত্তাল তরঙ্গশীর্ষে গা ভাসিয়ে দিয়েই মানুষ অত্যুন্নত গিরিশৃঙ্গকে অবহেলে অতিক্রম করে, ভাবের দ্রুত স্রোতের বেগেই মানুষ মাঝে মাঝে শতাব্দীর পথ দশবৎসরে অতিক্রম করে। এই রকমে মাঝে মাঝে ভাবের বন্যা না এলে মানুষের জীবন অচিরে অচল জলের মত পঙ্কিল আর বিষাক্ত হ'য়ে ওঠে। দরকার, ভাবের উন্মাদনাকে ধারণ করবার জন্যে উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয়ের।

বাঙ্গলা দেশটি ভাবের দেশ। এই জন্যেই এই দেশের মাটিতে মনুষ্যত্বের বিকাশ এত বেশী, এই জন্যেই বাঙ্গলা দেশের ইতিহাসে যত মহাপুরুষের আবির্ভাব হ'য়েছে তত আর অন্য কুত্রাপি হয় নি। এই জন্যেই আমাদের বিশ্বাস এই ভাবপ্রবণ জাতিই বর্ত্তমান জগতের সকল জটিল সমস্যার নিষ্পত্তি ক'রে বিশ্বমানবকে নূতন ধর্ম্ম নূতন প্রাণ দেবে।

আবার ঠিক এই ভাবাতিশয্যের কারণেই বাঙ্গলা দেশ এক হিসাবে অতি হীন দেশ। কেন না এ মাটিতে সব রকম প্লাবনেরই বিশেষ প্রাদুর্ভাব। শুদ্ধ-অশুদ্ধ-রজোগুণ-ভেদে দুই রকম ভাবের প্লাবনই এ মাটিতে সহজে সৃষ্টি হয়। অশুদ্ধ রজোভাবের বৃদ্ধিতে বহুশক্তিব্যয়ে অল্প লাভ হয়। সে কারণে এবারে আমরা বিশুদ্ধ রজোগুণের স্ফুর্ত্তি দেখ্‌তে চাই। বিশেষতঃ হিংসামূলক আন্দোলন এ যুগের উপযোগী নয়। এটা ভ্রাতৃভাবের যুগ; এখন আমাদের মর্ম ও বুদ্ধিকে এই ভ্রাতৃভাবের উপরে সুপ্রতিষ্ঠ ক'রে, আমাদের সকল কর্ম্ম প্রেরণাকে ঐ ভাবে ভাবিত ক'রে বিশুদ্ধ ক'রে তুল্‌তে হবে। আর তা' ক'রতে গেলে প্রথমে ভগবৎপ্রেমের সাধন আবশ্যক। সাধারণ মানুষের জড়তাকে জয় ক'রে তাদের মতিবুদ্ধিকে ভগবানের দিকে ফেরাবার জন্যে বিপুল আয়োজনে হরিনাম কীর্ত্তনের প্রয়োজন। আর সঙ্গে এই কীর্ত্তনের ভাবোন্মাদনাকে সংযত ক'রতে হবে সাধনার দ্বারা, সৎকর্ম্মের দ্বারা এবং উত্তম শিক্ষার দ্বারা। আমরা যখন বলি যে হরিনাম কর এবং তাঁত চালাও ও চাষবাসের শ্রীবৃদ্ধি কর তখন তার

এ রকম একটা মানে করা যুক্তিযুক্ত নয় যে এই তিনটি কাজ ছাড়া চতুর্থ কাজে কদাচ মনোযোগ দিও না। যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। হরিনামে মাতাল হও, কিন্তু বেচাল হ'য়ে কর্ম্মকে ভুলো না—এই হ'ল আমার কথার অতি সহজ তাৎপর্য্য বুঁদ মাতাল হ'য়ে টন্‌টনে জ্ঞানকে বজায় রাখাই হ'ল মানুষের শক্তির চরম বিকাশ। এই রকম মাতাল আমরা চাই, মাতাল অথচ চাল ভুল হয় না—যাকে পঞ্জাবের মহাপুরুষ সন্ন্যাসী রামতীর্থ বলেছেন, balanced recklessness.

এই রকমে যদি আমরা ভগবানে আত্মসমর্পণ শেখ্‌বার জন্যে নাম সাধনের আশ্রয় গ্রহণ করি, তা' হ'লে আমাদের অন্নসমস্যা, সমাজসমস্যা, রাষ্ট্রসমস্যা সমস্তেরই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মীমাংসা হবে। নতুবা একদিক সাম্‌লাতে গিয়ে আর এক দিক ফস্‌কে যাবে। এই রকম ভাবের উন্মাদনাতে শক্তি বৃদ্ধি হবে, ত্যাগে নিষ্ঠা আস্‌বে, কর্ম্মের কৌশল বুদ্ধির দর্পণে অভ্রান্তভাবে প্রতিফলিত হবে, তখন কোন কাজেই আর বেচালে পা প'ড়বে না, তখন সমাজের মধ্যে এমন সকল ব্যবস্থা স্বভাবতঃ প্রবর্ত্তিত হবে, যাতে ক'রে বাহিরের

পরাধীনতাটা অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌বে, তখন আমাদের চরিত্রে এমন বল সঞ্চিত হবে যার সম্মুখে কুশাসনের সিংহাসন সত্যি সত্যি ট'লবে। জগতের ইতিহাসে ঐ অপূর্ব্ব ব্যাপার ভারতে সংঘটিত হবে। যদি এ কথায় তোমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে এ পথে ঝাঁপিয়ে পড়, যদি বিশ্বাস না থাকে, নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তে অন্য উপায় অবলম্বন কর। বিরোধ ক'রে, অনর্থক শক্তির ক্ষয় ক'র না।

গোপাল। আপনার এই আদর্শ খুবই বড়। লোকে ধারণা ক'রতে পারবে ব'লে বোধ হয় না।

আমি। হাঁ খুব বড়। এই হ'ল এখন ভারতের কর্ম্ম-ক্ষেত্রে চূড়ান্ত আদর্শ মানুষের মনে এই আদর্শের উদ্বোধন হ'য়েছে ব'লেই আমরা একটা নূতন সত্যযুগের, প্রেমের যুগের, শক্তির যুগের আভাস পেয়েছি। ভারতে—বাঙ্গলায় এই আদর্শের উদ্ভব হ'য়েছে এইখানে এই আদর্শ পরিপুষ্ট হ'য়ে সমস্ত পৃথিবীতে সঞ্চারিত হবে। সুদীর্ঘ পথ,—আচার ধৈর্য্য, যুগান্তিক অধ্যবসায়, কঠোর সাধনার দরকার। পৃথিবীর সকল জাতি এই পথে আস্‌বার জন্যে ঋজু কুটিল নানা পথে ছুটাছুটি ক'রে একটা বিরাট কোলাহলের সৃষ্টি

ক'রেছে। সকল পথই কালক্রমে এসে এই প্রশস্ত রাজ-পথে মিলিত হবে। মহামানবের বিরাট মিলন আমাদের সম্মুখে, প্রকৃতির দুর্নিবার শক্তির ধাক্কা আমাদের পিছনে, পরমপিতার মঙ্গলাশীষ আমাদের মস্তকে. অফুরন্ত আশার প্রেরণা আমাদের বুকে। আদর্শ বড় ব'লে হতাশ হবার কি কারণ আছে? যুগের লক্ষণ সকল দেখে হিমাচলের মত এই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হও। শ্রীগান্ধির এই প্রেরণার অর্থ কি তা' হৃদয়ঙ্গম কর। তিনি ব'লেছেন, কেউ আমাদের শত্রু নয়, ইংরাজ আমাদের ভাই, মুসলমান আমাদের ভাই। প্রেম আর ক্ষমা আমাদের অস্ত্র। তাঁর আদর্শ যাই হোক্, তাঁর উপায়ের সঙ্গে আমাদের উপায়ের সর্ব্বাংশে মিল না থাক, কিন্তু তাঁর প্রেরণার উৎসমুখে প্রেমেরই জয় ঘোষিত হ'চ্ছে। যদি স্পষ্টভাবে তোমরা এই উপায়কে প্রেমের উপায় ব'লে ঘোষণা কর, যদি এর ভেতর থেকে সকল রকম হিংসার সংস্পর্শকে দূর ক'র্‌তে পার, তা হ'লে ও পথে আর এ পথে তিলমাত্র প্রভেদ থাকে না। তারপর আর একটা কথা হরিনামে যদি ইংরেজের সিংহাসন গ'ড়িয়ে না পড়ে, তবে এই নিরস্ত্র স্বরাজ সমরেই বা কেমন

ক'রে গড়িয়ে প'ড়বে ? মোটা বুদ্ধি যুক্তির বিচারে বুঝিয়ে দিতে পার এই স্বরাজের আন্দোলনে ইংরাজের কি ক্ষতি হবে ? যদি ক্ষমা ক'রতেই প্রস্তুত হ'য়ে থাক, তা হ'লে ভেবে দেখ, ইংরাজ তার প্রাপ্যগুলা তোমার ঘর থেকে জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে যাবার পথে কি বাধা আছে ? ইংরাজ যদি বলে, "আমরা রাজত্ব ছেড়ে দিলাম, শাসনকার্য্য ছেড়ে দিলাম, কিন্তু দস্যু হ'য়ে তোমাদের দেশেই থেকে গেলাম। আমাদের কাজ হ'ল কেবল নাদিরশাহী লুণ্ঠন। নাই বা থাক্‌লো গবর্ণমেণ্ট ; তোমরা ত অস্ত্রাঘাত ক'রবেনা ব'লে প্রতিশ্রুত হ'য়েছ, বেশ কথা, তোমরা ক্ষমা ক'রতে থাকো, আর আমরা লুণ্ঠন ক'রতে থাকি"—তা'হলে সাধারণ হিসাব বুদ্ধির তরফ থেকে কি উত্তর দিতে পার ? জড়ের শক্তি ছাড়া অন্য শক্তিকে যদি স্বীকার না কর, তা হ'লে সিদ্ধান্ত (logical conclusion) হয় এই যে ক্ষমা দ্বারা দস্যুতার নিরোধ হয় না, অতএব এই ক্ষমাযুক্ত স্বরাজ সময়ে কার্য্যোদ্ধার হবে না। কিন্তু না,—ক্ষমার একটা ক্ষমতা আছে, প্রেমের একটা শক্তি আছে। এই ক্ষমা আর প্রেম প্রকৃত স্বরূপে প্রকট হ'লে তার

সাম্‌নে অতিবড় দস্যুকেও মাথা হেঁট ক'রতেই হবে।

গোপাল। তবে আপনার মতে আমাদের কর্ত্তব্য কি তা আরও পরিষ্কার করে বলতে হবে, definite programme কিছু আমাদের সামনে ধ'রতে হবে, নইলে একরকমের ভাব ছেড়ে আর একরকমের ভাবের ফাঁদে প'ড়ে যাব।

আমি। আমি একটা প্রোগ্রাম বার ক'রবো, আর অমনি দেশ তাই অনুসরণ ক'রবে, তা আমি বিশ্বাস করি না। মানুষ বড় বিজ্ঞ, পাগলের প্রলাপে কাণ দেওয়া মোটেই তাদের স্বভাব নয়। তবে একটা ভরসার কথা কি জান?—আমি নেহাত একটা সৃষ্টিছাড়া লোক নই, আমার মত মাথা খারাপ মানুষ সংসারে আরও আছে। তিন হাজার না হোক, তিনশো পাগল একটু চেষ্টা ক'রলেই জুটে যেতে পারে। কিন্তু একটি দুটি করে জুটবে। আর তিনশো যখন জুটবে, তার পর তিন হাজার জুটতে মোটেই দেরী লাগবে না। প্রথমে যারা জুটবে, তাদের একটু 'বদ্ধ' পাগল হওয়া চাই। 'শেয়ান পাগল, বুচকি আগল' এক-

রকম পাগলামি আছে তাতে কুলোবে না। পাগলামিতে একেবারে বুঁদ মাতাল হ'য়ে থাকতে হবে। চতুর্দিকে যখন কেবলি বিদ্রূপ আর পীড়ন তখন তাতে নেশা ছুটে গেলে চ'লবে না। দেশের লোক যেমন নন-কো-অপারেশন করছে করুক—তাতে ভালই হবে। তারাই ক্রমে ফিরে এসে আমাদের দল পুষ্ট করবে। আমি চাই এমন কতক-গুলি মানুষ যারা এই সাধারণ আন্দোলন থেকে দূরে থাকবে;—ছমাসে স্বরাজ পাব কি ন'মাসে পাব, এই সব অহঙ্কারে জলাঞ্জলি দিয়ে যারা ভগবানে ষোল আনা আত্ম-সমর্পন ক'রতে প্রস্তুত হবে, বিলাতী জ্ঞান বিজ্ঞান শেক্‌স-পিয়ার মিলটন আপাততঃ কিছুদিন স্থগিত রেখে যারা স্বর্ণমন্দিরের মণিরত্নের সন্ধানে বেরুবে; বহু অর্ব্বুদ টাকা তুলে দেশময় জাতীয় শিক্ষার স্বপ্ন ছেড়ে দিয়ে যারা ছেঁড়া মাদুরে ব'সে শমদমতিতিক্ষাদি শিখতে চাইবে, পরিশ্রম, সেবা অমানিতা শিখতে চাইবে, ত্যাগ, বিনয়, সহিষ্ণুতা অভ্যাস করতে চেষ্টিত হবে. এবং প্রতিনিয়ত ভগবানে আত্মসমর্পণ করবার জন্যে আকুল হ'য়ে উঠবে। আমি চাই এমন বিশ পঞ্চাশজন মানুষ যারা ছেঁড়া কাপড়

প'রে তাঁত বুন্‌বে, প্রয়োজন হ'লে চাষীদের মত পোষাক প'রে মাটী কোপাতে যাদের লজ্জা বোধ থাক্‌বে না, হরিনামের তুফান তুলে যারা পথে খেয়ে বেঁড়াবে। আমি চাই এমন মানুষ হরিনামের শক্তিতে যাদের বিশ্বাস আছে, প্রেমের জগজ্জয়ী শক্তিতে যাদের বিশ্বাস আছে, প্রত্যেক মানুষকেই ভগবান ব'লে যাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে,—যদি এমন মানুষ দেশে থাকে, তবে তারাই প্রমাণ ক'রে দেখাবে যে ভারতের শক্তিকেন্দ্র কোথায়। স্থির জেনো যে স্বরাজের শুষ্ক আদর্শে ভারতবাসীর প্রাণ মাতাতে পার্‌বে না। হরিনামের সরস কথায় একদণ্ডে মানুষকে পাগল করে দেওয়া তা আমাদের অচীরে প্রমাণ ক'রতে হবে। তোমরা ত কত রকমের আয়োজন করে দেখেছ, কিন্তু ভারতবাসীর প্রাণের সাড়া পেয়েছ কি? একমাত্র নামের গুণে অসম্ভব সম্ভব হবে, জলে শিলা ভাসবে, আকাশে কুসুম ফুটবে, পাষাণ ফেটে শক্তিরূপা গঙ্গা বেরিয়ে দেশকে এবং বিদেশকে রক্ষা করবে। এই একমাত্র দরজা খোলা আছে, যেদিক দিয়ে ভারতের প্রাণের ভিতরে পৌঁছান যায় এই এক মন্ত্র আছে যাতে ভারতের প্রাণকে স্পন্দিত সঞ্জীবিত ক'রে

তুলতে পারা যায়। একমাত্র ভগবানের নামে ভারত সাড়া দেবে এবং নেচে উঠবে। তখন কি চাই কি না চাই, কি করতে হবে আর কি না করতে হবে, তা' সে আপনি বুঝবে। তখন ইংরাজ প্রভুর উচ্চাসন থেকে নেমে এসে ভারতের পদে বিলুণ্ঠিত হবে; তা দেখে সমস্ত জগৎ স্তব্ধ হ'য়ে, বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় ভারতকে নমস্কার করবে এবং ধন্য হবে। এ স্বপ্ন নয়, এ সত্যে পরিণত হবেই হবে। আর যত দিন না সত্য হয়, ততদিন আমাকে এমনি পাগলের মতই পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে। ইতি—

৩

দাদা, তোমাদের প্রথম সংখ্যা "সৎসঙ্গী" খানা আমার অনন্তশয্যার (যাহা দিবারাত্র একই ভাবে সটান বিস্তৃত থাকে) ওপরে, অন্যান্য কাগজপত্রের সঙ্গে, একখানা ঝাপ্‌সা নীল তপনদেবের চিত্র বুকে ক'রে চীৎ হয়ে প'ড়ে আছে, এমন সময়ে আমার এক প্রিয় কটুম্ব আমার বিছানার উপরে ব'স্‌লেন। কুটুম্বের একমাথা চুল, সাম্‌নের দিকে প্রায় ভুরুর ওপর পর্য্যন্ত লতাপাতা কাটা ; পোষাক-পরিচ্ছদ জামার কাট-ছাঁট একেবারে অপ্-টু-ডেট। বিছানায় ব'সেই নীলাম্বরী "সৎসঙ্গী" খানা অন্যমনস্ক হ'য়ে টেনে নিলেন। "এ যে নূতন কাগজ দেখছি" ব'লে মলাটের ওপর একটু মনঃসংযোগ ক'রেই পাতা উল্টোতে লাগলেন। "এ কারা বা'র করছে, দাদা?"

আমি ব'ললাম, "তুমি চিন্‌বে না ; কতকগুলো পাগল জুটে নূতন ভাব প্রচার করতে নেমেছে।"

কুটুম্ব। পাগলই বটে! এই 1920তে ছবি না দিয়ে

কাগজ চালাতে যাওয়াটা দুঃসাহসেরই কাজ। Art ব'লে একটা জিনিষ আছে ত ?

আমি। তাই নাকি! সেটা কি রকম জিনিস, ভাই ?

কু। ন্যাকা সাজ্‌ছো যে! কলা বোঝো না? সৌন্দর্য্যবোধ বলে একটা জিনিস নেই ?

আমি। ও কলা বুঝিনে। তবে সৌন্দর্য্য বোধ বলে একটা জিনিস আছে, তা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার ক'রছি। শিক্ষিত বাঙ্গালীর দেহের ভিতরটা কেবল চচ্চড়ী পরিপূরিত হ'লেও, চুলের বাহারে আর জামা-জোড়ার ফ্যাসানেই সে যেমন সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব করে, তেমনি আমাদের সাহিত্যও অন্তঃসারশূন্য হ'লেও কেবল তে-রঙ্গা ছবির জোরেই সুন্দর হ'তে চায়। মনে হিংসাদি জনিত অশান্তিকে দূর করবার চেষ্টা ক'রে আর সাতগোষ্ঠীর পেটের ভাতের ওবিরি মধ্যে একটু সুবন্দোবস্ত ক'রতে পারলে যে স্বাস্থ্য আর শান্তি মুখে ফুটে ওঠে, তার অভাব কি ভাই সাজগোজের দ্বারা পূর্ণ হয় ? চুলের বাহারের কথা ব'লছি ব'লে চটলে নাকি ? এই বলে তাকে বুকের মধ্যে এমন

ঠেসে ধরলাম সে একটু অপ্রতিভ হ'লো, আর ব'লে-উঠলো "যত মাথা খারাপের দল!"

আমি তাকে বন্ধনমুক্ত ক'রে একটু সুর করে বললাম, "যে মাথায় চুলের উপর ঢেউ খেলে না টেড়ির দু'পাশ দিয়ে, সে মাথা আর ভাল কিসে?"

কু। সৌন্দর্য্যের বিরুদ্ধে কিছু বল্লে সভ্যসমাজে বস্‌বার জায়গা হবে না যে?

আমি। সভ্যসমাজে ভারি বস্‌বার জায়গার টানাটানি। একখানা চেয়ারে দু'জন বসা যায় না। পাগলদের ফরাশে দশজনের জায়গাতে পনের জনেরও জায়গা করে নেওয়া যায়। তোমার সভ্যসমাজ যে কৃত্রিমতাকে সৌন্দর্য্য সাব্যস্ত ক'রে "আর্ট" ব'লে বাহবা দিচ্ছে, সে সৌন্দর্য্যের জন্যে "সৎসঙ্গী"র পরিচালকেরা বোধ হয় তেমন ব্যস্ত নয়।

কু। তোমার মতে সৌন্দর্য্যটা কি রকম?

আমি। যা' দেখলে বা বুঝ্‌লে চিত্ত প্রশান্ত হ'য়ে আসে তাই সৌন্দর্য্য; আর যার চিত্ত যত কম বিক্ষোভ প্রবণ, সে তত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি কর্‌বার আর উপলব্ধি কর্‌বার অধিকারী। কেবল রং-ফলানো ছবির সৃষ্টি ক'রে তোমরা

যে আর্টের গৌরব ক'রছ, সে আর্ট, ভাই, এ নূতন যুগে চ'লবে না। চিত্রকলাই বল, আর কাব্যকলাই বল, মানুষের মন প্রশান্ত স্থির না হ'লে ওগুলো যথাযথভাবে স্ফূর্ত্তি পায় না। অন্তরের ভাবশিল্পের ভেতর সৌন্দর্য্য ফুটে না উঠলে, বাহিরের শিল্পকলায় যেটা ফুটে উঠে সেটা ঠিক ঠিক সৌন্দর্য্য নয়। সে জন্ত বাজারে যে ছবির ছড়াছড়ি দেখতে পাই, তার ভেতরে সৌন্দর্য্যের অন্বেষণের পরিচয় পাই মাত্র, তাতে সৌন্দর্য্যের প্রকাশ বিশেষ হ'চ্ছে না। ভিতরে যখন ভোগে অতৃপ্তি, ত্যাগে অপ্রবৃত্তি, সকল রকমের দারুণ অশান্তি, তখন বাহিরে হঠাৎ সাহিত্যকলাদি সুন্দর ও শান্ত রসাস্পদ হ'য়ে ফুটে উঠবে এ অসম্ভব। আর্ট ব'লতে তোমরা কি বোঝ, বা পণ্ডিত সমাজে কি বোঝে তা' আমি জানি না; তবে আমার সহজ বুদ্ধিতে এই আসে যে মানুষ এখন শান্তির জন্যে যত লালায়িত ছবি দেখবার জন্যে তত নয়। তবে যে আমরা ছবির এত পক্ষপাতী এটা কতকটা ফ্যাশানের খাতিরে। এক-খানা ছবি দেখে ও তার প্রশংসা শুনে ভাল লাগাই হ'লো সভ্যসমাজের রীতি। রসিকতাটা বুঝতে না পারলেও

যে হিসেবে হাস্য করা প্রয়োজন, কোন পুস্তক না প'ড়লেও সমালোচনা করাই যে হিসেবে বিজ্ঞোচিত, একখানা চটকদার ছবি দেখে, বিশেষ ছবিখানা সুপরিচিত শিল্পীর কল্পিত হ'লে, সে ছবির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হওয়াই শিষ্টাচার সঙ্গত। ছেলেবেলায় একটা গল্প শুনেছিলাম। কোন পশ্চিমদেশীয় রাজা একদিন সংবাদ পেলেন যে বহুদূর হ'তে একজন বিখ্যাত গায়ক তাঁর রাজ্যে আগমন ক'রেছেন; কিন্তু একলক্ষ টাকা মুজরো না পেলে তিনি মুখ খোলেন না। প্রজাদের বড় সাধ যে একবার তাঁর গাওনা শোনে; কিন্তু লক্ষ টাকা দেয় কে? রাজা শুনে আদেশ ক'রলেন, "আমি লক্ষ টাকা দিব। ওস্তাদজীকে আমার দরবারে নিমন্ত্রণ কর।" নির্দ্দিষ্ট দিনে যথাকালে রাজসভা লোকে লোকারণ্য হ'লো। সারঙ্গী তবল্‌চী আদি বাদ্যকর সঙ্গে গায়ক রাজসভায় উপস্থিত হ'লেন। তারপর ঘণ্টাখানেক ধ'রে কাণমোচড় আর হাতুড়ি-ঠোকাঠুকির পর ওস্তাদজী, রাজা ও সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে সম্বোধন ক'রে বল্লেন, "আমার সঙ্গীত শ্রবণে কেবল সতীপুত্রেরই অধিকার। যাঁরা সতীপুত্র নন,

তাঁদের কর্ণে আমার সঙ্গীত কোনদিনই প্রবেশ করে নি—তাঁদের এ সভায় অপেক্ষা করা বৃথা। কিন্তু সভা থেকে একটী প্রাণীও ন'ড়ল না। সকলেরই মনে মনে একটা আশঙ্কা হ'লো, যদি গান শুন্‌তে না পাই! ওস্তাদজী দাঁড়িয়ে উঠে গান আরম্ভ ক'রলেন; মুখব্যাদান ক'রে, নানারকম মুখভঙ্গী ক'রে, কখনও কাণ একহাতে চেপে ধ'রে, কখনও দু'হাত নেড়ে, ঘাড় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে সঙ্গীতের অভিনয় ক'রতে লাগ্‌লেন। বলা বাহুল্য, ওস্তাদজীর অন্তরনিহিত সুরলহরী আদৌ আকাশে ধ্বনিত হয় নাই। সভাশুদ্ধ লোক নিস্তব্ধ হ'য়ে ভাব্‌ছিল যে গান ত শোনা যাচ্ছে না, এখন উপায়? প্রধান মন্ত্রী যিনি, তিনি কাণে কিঞ্চিৎ খাটো; বধিরতার মাত্রাটা কখনও কিঞ্চিৎ বাড়ে কখনও কিঞ্চিৎ কমে। তিনি ভাব্‌লেন, বুঝি কাণের দোষেই আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। কাণের দোষটা পাছে কুলের ঘাড়ে চাপে এই আশঙ্কায় তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। ব'লে উঠলেন, "কেয়াবাৎ হায়, বহুত আচ্ছা ভাই। পর মুহূর্ত্তেই চতুর রাজা, "বহুৎ খুব, ওস্তাদজী" ব'লে গলার বহুমূল্য হারছড়া তার দিকে নিক্ষেপ ক'রলেন। এখন

বুঝে দেখ, সতীপুত্র হ'তে কার না সাধ। একজন দুইজন ক'রে ক্রমে সভাশুদ্ধ লোকই উচ্চরবে ওস্তাদজীর গুণপনার তারিফ ক'রে উঠলেন। তখনি ওস্তাদসাহেব নিরস্ত হ'য়ে লাখ্ টাকার তোড়া আর হারছড়া সাম্‌নে নিয়ে রাজাকে অভিবাদন ক'রে নিঃশব্দে চম্পট দিলেন। সে দেশের লোকে কুলকলঙ্কভয়ে এখনও পরস্পরে ওস্তাদের গুণপনার প্রশংসা করে।

অতএব যখন একজন সুপরিচিত শিল্পীর একটা দুর্বোধ্য আর্ট-চিত্র মাসিকপত্রের প্রথম পৃষ্ঠাকে কাঁকালো ক'রে আমাদের চক্ষুর্গোচর হয়, তখন আমরা শিক্ষাভিমানের দায়ে সেটাকে তারিফ ক'রতে বাধ্য।

যাই হোক্ খাঁটি সৌন্দর্য্যের একটা স্পষ্ট লক্ষণ আছে। সে সৌন্দর্য্যের দর্শনে, অনুভবে ও উপলব্ধিতে চিত্ত সংযত শান্ত, সমাহিত হয়। কিন্তু ভেতরে ভাব না থাক্‌লে সৌন্দর্য্যের দর্শন হয় না, সৃষ্টি ত করা যায়ই না? ভাবের জগতেই সৌন্দর্য্যের বাস। একজন চাষা আর একজন ভাবশিল্পী দু'জনে একই দিনে প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তী পথ দিয়ে পূব্‌মুখো হ'য়ে যাচ্ছে। যে চাষী সে হয় ত হিংসায় জরজর

হ'য়ে ভাবছে কেমন ক'রে পাশের দু'বিঘে জমি, জ্ঞাতিকে ঠকিয়ে, আত্মসাৎ ক'রবে। আর একজনের মন পূবের ঐ রাঙ্গা আকাশের রঙ্গে আর ফুরফুরে প্রভাতী হাওয়ার নেশায় টলমল ক'রছে, আর তার মনটা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের ভেতর সমাহিত হ'য়ে প্রাণের গভীর প্রদেশে আনন্দময়ের বাঁশীর আওয়াজ শুনে আত্মহারা হ'য়ে গেছে। এখন এই দুই জন একই স্থানে, একই আবেষ্টনের মধ্যে অবস্থিত হ'য়েও, ভাবের তারতম্যহেতু একজনের প্রাণ বাহিরের সৌন্দর্য্যে কেমন সুন্দর সাড়া দিল, অপরজনের প্রাণ মোটেই সাড়া দিল না। অতএব ভাই, ভিতরের ভাবকে জাগিয়ে তোলাই হ'চ্ছে পরম আর্ট। আর সেদিকে বিশেষ চেষ্টা না ক'রে, মানুষকে যতই কেন ছবি দেখাও না, তাতে সাহিত্যের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। ছবির ভেতের প্রকৃতির সৌন্দর্য্যই দেখাও, আর life থেকে realistic দৃশ্যই দেখাও, না লম্বা আর সরু স্ত্রীমূর্ত্তির ভেতর দিয়ে ভাবের কেরামতিই দেখাও, * তাতে মানুষের দুঃখ ঘোচাতে পারবে

---

* এই জাতীয় নূতন চিত্রকলায় যে উদ্ভব হয়েছে, তার ভেতরে

না। ছবি খুব ভাল জিনিস, যদি সেটা প্রকৃতিতে আর জীবনে সৌন্দর্য্যে রচনা করতে আমাদের চিত্তকে প্রবৃত্ত করে, আর বহিঃপ্রকৃতির ও জীবনের সৌন্দর্য্য তখনই সার্থক হয়, যখন তা আমাদের মনকে ঝড়ের মধ্যে শান্ত রাখে, সীমার মধ্যেও অসীমের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেয়, দুঃখের মধ্যেও আনন্দের সৃষ্টি করে। ভেতরের সুখের সূত্রটা যতই বেহাত হ'চ্ছে, বাহিরের সরঞ্জামের দিকে মন ততই বেগে ধাবিত হ'চ্ছে। তাই কাজের চেয়ে বক্তৃতার বহর বেশী, স্বাস্থ্যের চেয়ে টেড়ির দিকে নজর বেশী, মানুষের চেয়ে মানুষের পদবীর আদর বেশী। আসল কথা এই যে তোমরা যাকে আর্ট বল, সে আর্টকে অন্তর্মুখী হ'তে হবে; আর তাই হ'লে আমরা উন্মুক্ত আকাশের তলের প্রান্তরকে দেয়ালে ঝোলানো landscapeএর চেয়ে বেশী খাতির ক'রতে শিখ্‌ব। ছবি জিনিসটা ভালই—

মানুষের হাত পা মানুষের মত রেখেই ভাবের খেলায় ঐ রকম গুণপনা প্রকটিত হ'তে পারে, আর বোধ করি এর পরবর্ত্তী চেষ্টার গতি ঐ দিকেই।

বাধা দিয়ে ভায়া আর্ট বাঁচিয়ে "হেঃ—হেঃ—হেঃ" ক'রে গোটাকতক বিসর্গযুক্ত মৃদু হাস্তধ্বনি ক'রে (হো—হো ক'রে প্রাণ খুলে উচ্চ হাস্তটা সভাসমাজে নিতান্তই অচল) ব'ল্লেন—

"অনেকগুলো কথা একনিশ্বাসে ব'লে ফেলছো যে! ভাবের ঘোরে ভেসে গেলে ত হবে না। বাজার বোঝা চাই। You must take the world as it is."

সম্পাদক ভায়া, তোমরা কি জন্যে ছবির দিক দিয়ে যাওনি তা' আমি জানি না। ক্রমশঃ ছবি দেবার চেষ্টায় আছ কি না তাও আমি জানি না। প্রথম সংখ্যা brief প'ড়ে তোমাদের caseটা যেমন বুঝেছি, তেমনি plead করা ভিন্ন উপায় কি? আমার মনের কথা তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে যদি ভুল ক'রে থাকি, তবে শুধ্রে নিও, আমি ব'লাম—

"We must make the world as it should be" বাজার আবার কি? এই যে বাঙ্গলা দেশ ছেয়ে সতীর বায়ান্ন পীঠের মত বায়ান্ন জায়গায় দলে দলে পাগলদের

আবির্ভাব দেখতে পাচ্ছি, এরা বাজার-ফাজার মান্‌বে না। এরা তন্ত্র-বেতির ভাবের এমনি হুজুগ তুলবে, ভাবের রাজ্যে এমন সব যুদ্ধ-ঘোষণা ক'রবে, যে বাজারদর একেবারে ওলট-পালট ক'রে দেবে। কত বড় বড় সওদাগরকে লালবাতি জ্বালতে হবে, আবার কত ছোট ব্যাপারীও ক্রোরপতি হ'য়ে উঠবে। কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধ'রে বেঁচে থাক্‌বার চেষ্টা কর। ইনফ্লুয়েঞ্জায় ম'র' না, বহুত দেখে যেতে পারবে। এবারে আর পলিটিক্যাল হুজুগ নয়। ও হুজুগটা বাঙ্গলাদেশ আপাততঃ ছাড়বার মুখেই দাঁড়িয়েছে।"

"তোমার পাগলামিটা, দাদা, ক্রমেই কিন্তু বেড়ে উঠছে। চল্লাম আজকের মত," ব'লে তিনি উড়ুনীখানা বেশ gracefully বাগিয়ে নিয়ে, ছড়িখানা ঈষৎ দোদুল্যমান ক'রে হেলে দুলে বেশ নিপুণ ভঙ্গীতে পা ফেলে চলে' গেলেন।

ভায়া, পুরাণো বোতলে নূতন মদ রাখতে গেলে বোতলটাও ফেটে যাবে আর মদটাও গ'ড়িয়ে প'ড়বে। যীশুর সেই কথাটাই আমার মনে আসছে—"New wine

must be put into new bottles." নূতন প্রতিষ্ঠান চাই। কিন্তু পুরাণোগুলোকে ভাঙ্গবার দিকে আমাদের ঝোঁকটা বেশী দিলে চ'লবে না। যারা ভাঙ্গবে তারাও খোন্তা-সাবল নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে এসেছে। আমরা শুধু গ'ড়ে যাব। ভেতরে ভাবের পরে ভাব সাঁজিয়ে যাব, আর বাহিরে দিব্য রূপসকল আপনি ফুটে উঠবে। উত্তম সাধক দিব্যরূপ দর্শনের জন্য আকুল হয় না। ভাব জমাট বেঁধে এলে দিব্যরূপটা আপনি ফুটে ওঠে। ইতি